অষ্টম অধ্যায়

রসায়ন ও শক্তি

রাসায়নিক বন্ধন মূলত শক্তির আধার। রাসায়নিক বন্ধন ভাঙ্গাগড়ার সা থে শক্তি নিহিত। পৃথিবীতে যত রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে সকল ক্ষেত্রেই শক্তির রূপান্তর হয়। এই পরিবর্তনগুলোর মধ্যে যেগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটে সে পরিবর্তনের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে আমরা দৈনন্দিন কাজ করি। পৃথিবীতে এই শক্তির পরিমাণ সীমিত যা দিন দিন কমে আসছে। তাই আমাদের বিকল্প শক্তির কথা চিন্তা করা প্রয়োজন। ইতোমধ্যে সূর্যকে কাজে লাগিয়ে সোলার প্যানেল তৈরি করে বাতি জ্বালানের পরিমাণ বৃদ্ধি করার চেষ্টা চলছে। অন্য দিকে উন্নত দেশের ন্যায় পারমাণবিক শক্তিকে ব্যবহার করার প্রচেষ্টা আমাদের দেশে শুরু হয়েছে।



এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা:

(১) রাসায়নিক পরিবর্তনের সাথে শক্তি উৎপাদনের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব।

(২) শক্তি উৎপাদনে জ্বালানির বিশুদ্ধতার গুরুত্ব অনুধাবন, পরিবেশ সুরক্ষায় এগুলোর ব্যবহার সীমিত রাখতে ও উপযুক্ত জ্বালানি নির্বাচনে সচেতনতার পরিচয় দিতে পারব।

(৩) নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে রাসায়নিক বিক্রিয়াসংশি ্লষ্ট সমস্যা চিহ্নিত করে তা অনুসন্ধানের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন এবং এর কার্যকারিতা মূল্যায়ন করতে পারব।

(৪) রাসায়নিক বিক্রিয়া সংগঠনে এবং শক্তি উৎপাদনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ও আত্মবিশ্বাসের সাথে দায়িত্বশীল সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হব।

(৫) জারণ-বিজারণ বি ক্রয়ার ইলেকট্রনীয় মতবাদ ব্যবহার করে চল বিদ্যুতের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।

(৬) রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব।

(৭) বিদ্যুৎ ব্যবহার করে বিক্রিয়া সংগঠন করতে পারব।

(৮) বিভিন্ন পদার্থের তড়িৎ বিশ্লেষণে উৎপাদিত পদার্থ এবং এর বাণিজ্যিক ব্যবহার সম্পর্কে মতামত দিতে পারব।

(৯) তড়িৎ রাসায়নিক কোষ ও গ্যালভানিক কোষের মধ্যে পার্থক্য করতে পারব।

(১০) তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্পর্কে মতামত দিতে পারব।

(১১) তাপহারী ও তাপউৎপাদী বিক্রিয়ার পরীক্ষা করতে পারব।

(১২) রাসায়নিক দ্রব্যের ক্ষতিকর দিকসমূহ সম্পর্কে সচেতনতা প্রদর্শন করতে পারব।

(১৩) বিশুদ্ধ জ্বালানি ব্যবহারে আগ্রহ প্রদর্শন করতে পারব।

(১৪) লবণ দ্রবীভূত ও রাসায়নিক পরিবর্তন হওয়ার সময় তাপের পরিবর্তন পরীক্ষার সাহায্যে দেখাতে পারব।

(১৫) গ্যালভানিক কোষের তড়িৎদ্বার গঠন করতে পারব।

১.১ রাসায়নিক শক্তি

ক. বন্ধনশক্তি ও রাসায়নিক বিক্রিয়ায় শক্তির পরিবর্তন

আমরা জেনেছি যে, কোনো যৌগে মৌলসমূহ তাদের মধ্যে পারস্পরিক (mutual) শক্তি দ্বারা যুক্ত থাকে। মৌলসমূহের একে অপরের সাথে যুক্ত হওয়ার শক্তিই হলো রাসায়নিক বন্ধন। তাছাড়াও কোনো পদার্থের অণু বা আয়নসমূহ একে অপরের সাথে নানা শক্তির সমন্বয়ে গঠিত 'আন্তঃআণবিক শক্তি' (intermolecular force) নামক শক্তির মাধ্যমে কাছাকাছি থেকে একটি নির্দিষ্ট অবস্থা, যেমন– কঠিন, তরল বা বায়বীয় অবস্থার সৃষ্টি করে। কোনো দ্রবের অণু বা আয়নসমূহের মধ্যে আন্তঃআণবিক শক্তি বেশি হলে– কঠিন, কম হলে– তরল ও আরও কম হলে– বায়বীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়। তাহলে একই দ্রবের অবস্থাভেদে আন্তঃআণবিক শক্তি ভিন্নতর হয়। যেমন– বরফ, পানি ও জলীয়বাষ্প হলো– পানির কঠিন, তরল ও বায়বীয় অবস্থা। পানিকে তাপ (শক্তি) দিলে জলীয়বাষ্পের সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ পানি তাপ শোষণ করে তরল থেকে বায়বীয় পদার্থে পরিণত হয়। আবার পানিকে ঠান্ডা করলে, অর্থাৎ পানি থেকে তাপ বের করে নিলে পানি কঠিন (বরফ) দ্রবে পরিণত হয়।

অন্যদিকে, রাসায়নিক বন্ধন তৈরির সাথেও শক্তি জড়িত। ভিন্ন যৌগে অণুসমূহ ভিন্ন বন্ধনশক্তি দ্বারা যুক্ত থাকে। যদি বিক্রিয়ায় উৎপন্ন যৌগের মোট শক্তি বিক্রিয়কসমূহের মোট শক্তির চেয়ে কম হয় অথবা বেশি হয় তাহলে কী হতে পারে চল ভেবে দেখা যাক। উৎপন্ন যৌগে মোট শক্তির পরিমাণ কম হলে বিক্রিয়ার ফলে শক্তির উদ্ভব হবে, এবং বেশি হলে শক্তির শোষণ ঘটবে। মোটকথা, যে কোনো রাসায়নিক পরিবর্তনে কমবেশি শক্তির উদ্ভব বা শোষণ হয়ে থাকে, যদিও তা সবসময়ই আমরা অনুভব করতে পারি না। তাহলে এটা স্পষ্ট যে, দ্রবের অবস্থার পরিবর্তনের সাথে যেমন শক্তি জড়িত, রাসায়নিক বিক্রিয়ায় মাধ্যমে নতুন পদার্থে পরিণত হবার প্রক্রিয়ার সাথে তেমন শক্তি জড়িত।

খ. তাপ উৎপাদী বিক্রিয়া ও তাপহারী বিক্রিয়া

এবার উপরের আলোচিত বিষয়বস্তু থেকে বিক্রিয়াকে তাপের ভিত্তিতে ভাগ করি। তাপের পরিবর্তনের ভিত্তিতে রাসায়নিক বিক্রিয়া দুই প্রকার, যথা : (১) তাপউৎপাদী ও (২) তাপহারী বিক্রিয়া ।

তাপ উৎপাদী বিক্রিয়া: যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তাপ উৎপন্ন হয় তাকে তাপ উৎপাদী বিক্রিয়া বলে। যেমন: কাঠ, কয়লা বা গ্যাস পোড়ালে তাপ উৎপন্ন হয়। কাঠ বা কয়লা মূলত কার্বন এবং কার্বনের বিভিন্ন যৌগ, যা দহনের মাধ্যমে বায়ুর অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে কার্বন–ডাই–অক্সাইড (CO_2) ও তাপ উৎপন্ন করে। চুন পানিতে দিলে তাপ উৎপন্ন হয়। চুন হলো ক্যালসিয়াম অক্সাইড (CaO), যা পানির সাথে বিক্রিয়া করে ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড; $Ca(OH)_2$ ও তাপ উৎপন্ন করে।

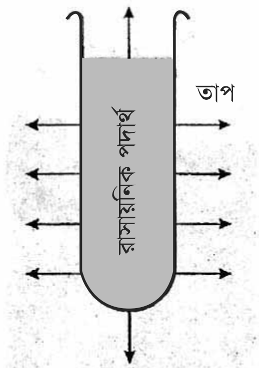
$$C(s) + O_2\ (g) \rightarrow CO_2\ (g) + \text{তাপ}$$

$$CaO\ (s) + H_2O\ (l) \rightarrow Ca(OH)_2\ (aq) + \text{তাপ}$$

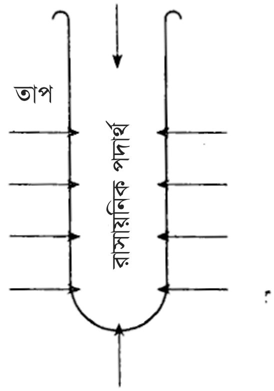
এবার তাপশক্তি নির্গত হওয়ার বিষয়সমূহ ব্যাখ্যা করা যাক। প্রথম ক্ষেত্রে, বিক্রিয়ক কার্বন ও অক্সিজেনের মধ্যে মোট স্থিত রাসায়নিক শক্তি উৎপাদিত যৌগ কার্বন–ডাই–অক্সাইড মধ্যে স্থিত রাসায়নিক শক্তির চেয়ে বেশি। অনুরূপভাবে, উৎপাদ ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড–এর মধ্যে স্থিত রাসায়নিক শক্তি বিক্রিয়ক ক্যালসিয়াম অক্সাইড ও পানির মধ্যে মোট স্থিত রাসায়নিক শক্তির চেয়ে কম। সহজে বলা যায়, বিক্রিয়কের মধ্যে স্থিত মোট রাসায়নিক শক্তি নতুন যৌগ গঠনে ব্যয় হওয়ার পর অতিরিক্ত অংশ তাপ হিসেবে বের হয়, অর্থাৎ নির্গত তাপশক্তি = উৎপাদ যৌগসমূহের মোট শক্তি (E_2) – বিক্রিয়ক যৌগসমূহের মোট শক্তি (E_1)।

বিক্রিয়া তাপ: কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ায় পরিবর্তিত তাপকে বিক্রিয়া তাপ বলে।

দহন তাপ: এক মোল পরিমাণ পদার্থকে দহন করলে যে তাপের উৎপন্ন হয় তাকে দহন তাপ বলে।



চিত্র-৮.১: তাপ-উৎপাদী বিক্রিয়া।



চিত্র-৮.২:তাপহারী বিক্রিয়া।

তাপহারী বিক্রিয়া: যে রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত হওয়ার জন্য তাপের শোষণ ঘটে, তাকে তাপহারী বিক্রিয়া বলে। তাপউৎপাদী বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমরা সচরাচর তাপের উদ্ভব প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করি, কিন্তু তাপহারী বিক্রিয়া ক্ষেত্রে খুব কমই তাপ শোষণের ঘটনা বুঝতে পারি। এবার চল, তাপ শোষণ হয়েছে এমন ঘটনা বুঝবার চেষ্টা করি। 60° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় অর্ধেক গ্লাস গরম পানি আছে। এর মধ্যে একটুকরা বরফ যোগ কর। নিশ্চয়ই আমরা বুঝতে পারি যে, কিছুক্ষণের মধ্যেই বরফটুকরাটি গলবে, আর সাথে সাথে পানির তাপমাত্রাও কমে যাবে। এভাবে সচরাচর আমরা পানীয়কে ঠান্ডা করতে বরফটুকরা ব্যবহার করে থাকি। আমরা উপরে জেনেছি যে, পানি থেকে শক্তি বের করলে পানি তরল থেকে কঠিনে (বরফে) পরিণত হয়। তাহলে এটা স্পষ্ট যে, গৃহীত শক্তি (তাপ) বরফকে ফেরত দিলে কঠিন বরফ তরল পানিতে পরিণত হবে। প্রকৃতপক্ষে, গ্লাসে রাখা বরফটুকরাটি গরম পানি থেকে তাপ (শক্তি) গ্রহণ করে পানিতে পরিণত হয়। তার ফলে গরম পানির তাপমাত্রা কমে যায়। তাহলে বরফটুকরা তার চারপাশ (পরিবেশ) থেকে তাপ শোষণ করে পানিতে পরিণত হয়। অনুরূপভাবে রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত হওয়ার জন্য তাপের শোষণ হতে পারে। এক্ষেত্রে কখনো কখনো রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত করার জন্য ব্যবহৃত পাত্রের গায়ে হাত দিলে ঠান্ডা অনুভূত হয়। আবার কখনো বাহির থেকে তাপ দেওয়া ছাড়া বিক্রিয়াই হয় না। যেমন: খাবার সোডা ও লেবুর রস বা ভিনেগারের বিক্রিয়ার সময় তাপের শোষণ ঘটে। খাবার সোডা হলো– সোডিয়ামবাইকার্বনেট ($NaHCO_3$)। অপরদিকে লেবুর রসে সাইট্রিক এসিড ও ভিনেগারে এসিটিক এসিড থাকে। সোডিয়ামবাইকার্বনেট এসিডের সাথে বিক্রিয়ায় কার্বনডাইঅক্সাইড, লবণ ও পানি উৎপন্ন করে। বিক্রিয়াটি সংঘটিত হওয়ার সময় দ্রবণ থেকে তাপ শোষণ করে, ফলে আমরা দ্রবণটি ঠান্ডা হতে দেখি।

$$NaHCO_3(aq) + CH_3COOH(aq) + \text{তাপ (দ্রবণ থেকে শোষিত)}$$
$$\longrightarrow CH_3COO^{-}Na^{+}(aq) + CO_2(g) + H_2O(l)$$

অথবা

$$NaHCO_3(aq) + H^{+}(aq) \text{ (সাইট্রিক এসিড)} + \text{তাপ (দ্রবণ থেকে শোষিত)}$$
$$\longrightarrow Na^{+}\text{-লবণ (সোডিয়াম সাইট্রেট)} (aq) + CO_2(g) + H_2O(l)$$

গ. রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তাপের পরিবর্তনের হিসাব

রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার সময় পুরাতন বন্ধনের ভাঙন এবং নতুন বন্ধন গঠিত হয়। রাসায়নিক যৌগে বিদ্যমান পৃথক পৃথক বন্ধনের শক্তি আলাদা হয়। বন্ধন ভাঙার জন্য শক্তির প্রয়োজন হয় এবং বন্ধন গঠনের জন্য শক্তি নির্গত হয়। রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কী কী বন্ধন ভাঙে ও তার জন্য প্রয়োজনীয় মোট শক্তি হিসাব এবং কী কী নতুন বন্ধন গঠিত হয় ও তার জন্য নির্গত মোট শক্তি হিসাব করে নিচের সমীকরণ ব্যবহার করে বিক্রিয়ায় তাপের পরিবর্তন হিসাব করা হয়।

বিক্রিয়ায় তাপের পরিবর্তন = পুরাতন বন্ধন ভাঙার জন্য প্রয়োজনীয় মোট শক্তি – নতুন বন্ধন গঠিত হওয়ায় নির্গত মোট শক্তি

তাপের পরিবর্তন ঋণাত্মক হলে বিক্রিয়া তাপউৎপাদী এবং ধনাত্মক হলে বিক্রিয়া তাপহারী।

টেবিলে প্রদত্ত বন্ধনশক্তির সাহায্যে বিক্রিয়ায় নিচের তাপের পরিবর্তন হিসাব কর:

$$CH_3CH_{3(g)} + Cl_{2(g)} \longrightarrow CH_3CH_2Cl_{(g)} + HCl_{(g)}$$

এই বিক্রিয়ায় এক মোল C-H ও এক মোল Cl-Cl বন্ধন ভাঙে এবং এক মোল C-Cl ও এক মোল H-Cl নতুন বন্ধন গঠিত হয়। এক মোল C-H ও এক মোল Cl-Cl বন্ধন ভাঙার জন্য প্রয়োজনীয় মোট শক্তি = (414+ 244) কিলোজুল = 658 কিলোজুল। এক মোল C-Cl ও এক মোল H-Cl নতুন বন্ধন গঠিত হওয়ায় নির্গত মোট শক্তি = (326 + 431) কিলোজুল = 757 কিলোজুল।

বন্ধন	বন্ধনশক্তি (kJ/ মোল)
C-H	414
H-H	435
C-Cl	326
O-H	464
Cl-Cl	244
O=O	498
H-Cl	431

অতএব বিক্রিয়ায় তাপের পরিবর্তন (ΔH) =

পুরাতন বন্ধন ভাঙার জন্য প্রয়োজনীয় মোট শক্তি – নতুন বন্ধন গঠিত হওয়ায় নির্গত মোট শক্তি

= (658- 757) কিলোজুল

= - 99 কিলোজুল

অর্থাৎ বিক্রিয়ায় 99 কিলোজুল তাপ নির্গত হয়।

কাজ: নিচের বিক্রিয়াগুলোর বিক্রিয়া তাপ হিসাব কর।

$$2H_{2(g)} + O_{2(g)} \longrightarrow 2H_2O_{(g)}$$

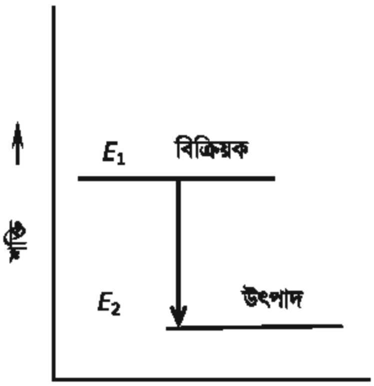
$$H_{2(g)} + 1/2O_{2(g)} \longrightarrow H_2O_{(g)}$$

$$CH_{4(g)} + 2Cl_{2(g)} \longrightarrow CH_2Cl_{2(g)} + 2HCl_{(g)}$$

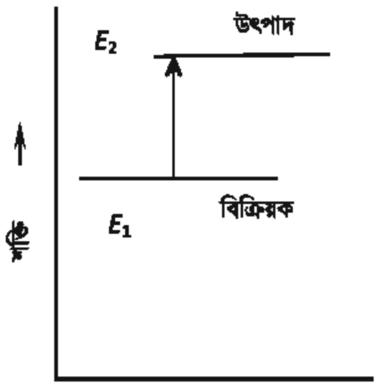
ঘ. বিক্রিয়ার শক্তি চিত্র

রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তাপের উৎপাদন ও শোষণ বিক্রিয়ার শক্তিচিত্রের মাধ্যমে সহজেই বুঝা যায়। চিত্র–৮.৩ ও চিত্র–৮.৪ তে তাপউৎপাদী ও তাপহারী বিক্রিয়ার শক্তিচিত্র পর্যবেক্ষণ কর। তাপউৎপাদী বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে বিক্রিয়কের মোট শক্তি (E_1) উৎপাদের মোট শক্তি (E_2) অপেক্ষা বেশি হয়, অর্থাৎ (E_1) > (E_2)। বিক্রিয়া সংগঠিত হওয়ার সময় বিক্রিয়কের

শক্তি থেকে উৎপাদ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি ব্যয় হওয়ার পর অতিরিক্ত শক্তি তাপশক্তি রূপে বের হয়। অন্যদিকে, তাপহারী বিক্রিয়ার শক্তিচিত্র তাপউৎপাদী বিক্রিয়ার উল্টো। তাপহারী বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে বিক্রিয়কের মোট শক্তি (E_1) উৎপাদের মোট শক্তি (E_2) অপেক্ষা কম হয়, অর্থাৎ (E_1) < (E_2)। এক্ষেত্রে বিক্রিয়কের মোট শক্তি উৎপাদের শক্তির তুলনায় কম থাকায় বিক্রিয়া সংগঠিত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি পরিবেশ থেকে শোষণ করে। সে কারণে তাপহারী বিক্রিয়া ঘটলে বিক্রিয়া মিশ্রণের তাপমাত্রা কমতে দেখা যায় অথবা বিক্রিয়া সংগঠিত করার জন্য তাপ দিতে হয়।



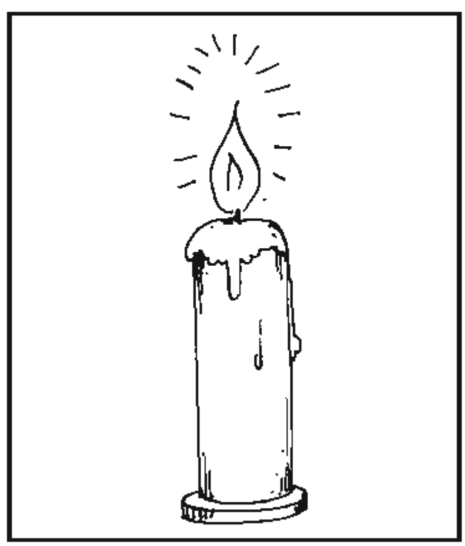
চিত্র-৮.৩: তাপ-উৎপাদী বিক্রিয়ার শক্তিচিত্র।
এখানে, $E_1 > E_2$।



চিত্র-৮.৪: তাপহারী বিক্রিয়ার শক্তিচিত্র।
এখানে, $E_2 > E_1$।

৮.২ রাসায়নিক শক্তি থেকে তাপ, বিদ্যুৎ ও আলোকশক্তিতে পরিবর্তন

আমরা দেখি যে, কোনো জিনিষ পোড়ালে তাপ উৎপন্ন হয়। তাপের সাথে সাথে আলোরও সৃষ্টি হয়। তাপ ও আলো উভয়ই শক্তি, যাহা তড়িৎ–চুম্বকীয় রশ্মি (electromagnetic radiation) হিসেবে চারদিকে ছড়ায়। কাঠ, কয়লা, গাছপালা, কাগজ, প্রাকৃতিক গ্যাস, কেরোসিন, পেট্রোলিয়াম প্রভৃতির দহনে তাপশক্তি ও আলোকশক্তির সৃষ্টি হয়। দিয়াশালাই ও মোমবাতি জ্বালিয়েও উভয় শক্তির সৃষ্টি করা যায় (চিত্র–৮.৫)। তাহলে এসব পদার্থের শক্তির উৎস কী? আর কোনো জিনিষ পোড়ানো বা দহনের অর্থই–বা কী?



চিত্র–৮.৫: জ্বলন্ত মোমবাতি।

আমরা জানি, পদার্থমাত্রই রাসায়নিক বন্ধনদ্বারা যুক্ত কতগুলো পরমাণুর গুচ্ছ। অন্যদিকে, দহন হলো– কোনো পদার্থের অণুকে অক্সিজেন দ্বারা জারিত করা। তাহলে কোনো পদার্থের অণুকে জারিত করার অর্থ অক্সিজেনযুক্ত নতুন পদার্থের সৃষ্টি, এবার নিচে প্রদত্ত বিক্রিয়াগুলো বিবেচনা করা যাক। কয়লার কার্বন (C), প্রাকৃতিক গ্যাসের মিথেন (CH_4) ও হাইড্রোজেন জ্বালানির হাইড্রোজেন অণু (H_2) অক্সিজেন অণুর সাথে বিক্রিয়া করে কার্বন–ডাই–অক্সাইড গ্যাস ও পানি উৎপন্ন করে। কার্বন তাদের নিজেদের মধ্যকার বন্ধন ভেঙে কার্বন–অক্সিজেন (কার্বন–ডাই–অক্সাইড) বন্ধন গঠন করে। অনুরূপ ভাবে, দহনের ফলে মিথেনের কার্বন–হাইড্রোজেন বন্ধন ভেঙে কার্বন–অক্সিজেন (কার্বন–ডাই–অক্সাইড) এবং হাইড্রোজেন–অক্সিজেন (পানি) বন্ধন গঠিত হয়। আমরা জানি যে, সব বন্ধন বা অণু গঠনে একই

পরিমাণ কখন–শক্তির প্রয়োজন হয় না। আসলে, জ্বালানির দহনের ফলে উৎপন্ন পদার্থের অণু গঠনে ব্যয়িত শক্তি জ্বালানির অণুর মধ্যে স্থিত শক্তির তুলনায় কম। ফলে অতিরিক্ত শক্তি তড়িৎ-চুম্বকীয় রশ্মি হিসেবে চারদিকে ছড়ায়, যা আমরা আলো ও তাপ হিসেবে দেখি ও অনুভব করি।

$$C(s) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + \text{তাপ}$$

$$CH_4(g) + 2O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(l) + \text{তাপ}$$

$$H_2(g) + O_2(g) \rightarrow H_2O(l) + \text{তাপ}$$

জ্বালানি পোড়ানোর ফলে উদ্ভূত তাপশক্তিকে ব্যবহার করে তাপ ইঞ্জিনের টারবাইন (চাকা) ঘুরিয়ে বিদ্যুৎশক্তিতেও রূপান্তর করা হয়। আমাদের দেশে উৎপাদিত বিদ্যুৎশক্তির প্রায় পুরোটাই এভাবে জ্বালানি পুড়িয়ে উৎপন্ন করা হয়। অন্যদিকে হাইড্রোজেন ফুয়েল সেলে (এক ধরনের তড়িৎ বিশ্লেষ্য কোষ) হাইড্রোজেনকে না পুড়িয়ে তড়িৎ বিশ্লেষণ বিক্রিয়ার সাহায্যে সরাসরি বিদ্যুতে পরিণত করা হয়। বিভিন্ন ধরনের গ্যালভানিক কোষে যেমন– ড্যানিয়াল কোষ, ড্রাই সেল ও লেড স্টোরেজ ব্যাটারি রাসায়নিক শক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তর করা হয়। আবার গ্যালভানিক কোষে প্রাপ্ত বিদ্যুৎশক্তিকে আলোকশক্তিতে পরিণত করা যায়, যেমন– ড্রাই সেলের সাহায্যে টর্চ জ্বালানো। এভাবেই রাসায়নিক শক্তিকে বিভিন্ন শক্তিতে রূপান্তরিত করে মানুষের ব্যবহার–উপযোগী করা হয়।

৮.৩ রাসায়নিক শক্তি থেকে পাওয়া বিভিন্ন শক্তি কাজে লাগানো



চিত্র–৮.৬: কেরোসিন পুড়িয়ে হারিকেন আলো দিচ্ছে।

কাজ করার ক্ষমতা হলো– শক্তি। জ্বালানি পোড়ালে তাপ উৎপন্ন হয়। আর তাপ এক প্রকার শক্তি। কাঠ ও প্রাকৃতিক গ্যাস পুড়িয়ে রান্নাবান্না করা হয়। তাপশক্তিকে সরাসরি ব্যবহার করে ইট ও মাটির তৈরি বিভিন্ন তৈজসপত্র পোড়ানো হয়। নানা সামগ্রী তৈরিতে কলকারখানায় কাঁচামাল গলাতে বা গরম করতে তাপশক্তি ব্যবহার করা হয়। লৌহ ও ইস্পাত, সিরামিকস জাতীয় কারখানায় বিপুল পরিমাণে তাপের ব্যবহার হয়। বিভিন্ন খনিজ জ্বালানি (fossil fuel) যেমন– কয়লা, পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাসকে জ্বালানি হিসেবে তাপ ইঞ্জিনে (heat engine) পুড়িয়ে মোটরগাড়ি, জাহাজ, বিমান, রেলগাড়ি ও অন্যান্য ইঞ্জিনচালিত যানবাহন চালানো হয়। পেট্রোলিয়াম পুড়িয়ে স্যালো ইঞ্জিনের চাকা ঘুরিয়ে গভীর থেকে পানি উত্তোলন করা হয়। আমরা বাসা–বাড়িতে কেরোসিন বা মোমবাতি পুড়িয়ে আলো জ্বালাই। অন্যদিকে, আধুনিককালের সবচেয়ে জনপ্রিয় শক্তি হলো– বিদ্যুৎ। আমরা সর্বক্ষেত্রে বিদ্যুতের ব্যবহার দেখি। যদিও বিভিন্নভাবে বিদ্যুতের উৎপাদন করা যায়, তবে বিদ্যুৎ তাপ ইঞ্জিনে খনিজ জ্বালানি পুড়িয়ে টারবাইন ঘুরিয়ে তৈরি করা হয়। আমরা তড়িৎ রাসায়নিক কোষ ও ব্যাটারির মাধ্যমে



চিত্র–৮.৭: কৃষক ট্রাক্টরের তাপ ইঞ্জিনে ডিজেল পুড়িয়ে জমি চাষ করছে।

রাসায়নিক শক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তর করে আলো জ্বালানো, রেডিও–টিভি চালানো, পাখা ঘুরানো প্রভৃতি কাজে ব্যবহার করে থাকি।

৮.৪ রাসায়নিক শক্তির যথাযথ ব্যবহার

সব শক্তির উৎস হলো– সূর্য। তাহলে পরোক্ষভাবে রাসায়নিক শক্তির উৎসও সূর্য নয় কি? জীবচক্রে জেনেছ যে, উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে সূর্য থেকে শক্তি তার দেহে সঞ্চিত করে। আলোকশক্তি ও বায়ুর কার্বন–ডাই–অক্সাইড মিলে উদ্ভিদের দেহে বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক যৌগের সৃষ্টি হয়। উদ্ভিদ থেকে প্রাণিকুল শক্তি পায়। উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃত্যুর পর মাটিতে মিশে যায়। পরবর্তীতে এসব পদার্থ হাজার বছর ধরে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে পেট্রোলিয়াম, কয়লা ও প্রাকৃতিক গ্যাসরূপে ভূগর্ভে মজুদ হয়। এদেরকে জীবাশ্ম জ্বালানি (fossil fuel) বলে। আমরা এধরনের জ্বালানিকে খনিতে পাই। আমাদের দেশের তিতাস, হরিপুর, সাংগু প্রভৃতি প্রাকৃতিক গ্যাসক্ষেত্র ও বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি প্রসিদ্ধ। তোমাদের কী ধারণা এসব খনি থেকে কি গ্যাস বা কয়লা পেতেই থাকব? আসলে তা নয়। এক সময় এগুলো শেষ হয়ে যাবে। প্রশ্ন হতে পারে, যেহেতু প্রাণী ও উদ্ভিদ তো প্রতিনিয়তই জন্ম নিচ্ছে ও মারাও যাচ্ছে, তাহলে এসব খনিজ জ্বালানি শেষ হয়ে যাবে কেন? উত্তরটা খুবই সহজ। কারণ আমরা যে হারে জ্বালানি ব্যবহার করছি তথা খনি থেকে জ্বালানি উত্তোলন করছি, সে হারে ভূগর্ভে জ্বালানি মজুদ হচ্ছে না। তাহলে সহজেই অনুমান করা যায় যে, কিছুদিন পর এসব জ্বালানির মজুদ শেষ হয়ে যাবে। বিষয়টি যথার্থই এবং বলা হয় যে, জীবাশ্ম জ্বালানির মজুদ আগামী একশ বছরেই শেষ হয়ে যাবে।

উপরে জেনেছি যে, খনিজ জ্বালানিই মূলত আমাদের মোট শক্তির চাহিদার সিংহভাগ যোগান দিয়ে থাকে। তাছাড়া খনিজ জ্বালানির শক্তিকে অন্য শক্তিতে রূপান্তর করা (যেমন– বিদ্যুৎশক্তি) ব্যয়বহুলও বটে। উপরন্তু রাসায়নিক শক্তি বিশেষ করে খনিজ জ্বালানি ব্যবহারে পরিবেশের নানা রকমের ক্ষতি হয়। তাহলে রাসায়নিক শক্তি ব্যবহারে আমাদের করণীয় কী? আধুনিক যুগে রাসায়নিক শক্তির ব্যবহার ছাড়া চলা অসম্ভব । কিন্তু রাসায়নিক শক্তির পরিমিত ব্যয় নিশ্চিত করতে পারলে মজুদের উপর নিঃসন্দেহে চাপ কমবে, এতে করে আমরা দীর্ঘদিন জ্বালানির মজুদকে কাজে লাগাতে পারব। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা শক্তির অপচয় করছি। অপ্রয়োজনে চুলা জ্বালিয়ে রাখছি, আলো জ্বালাচ্ছি, পাখা ঘুরাচ্ছি, বিনোদনের জন্য রকমারী আলোকসজ্জা করছি এবং স্বল্প প্রয়োজনে ইঞ্জিনচালিত যানবাহন ব্যবহার করছি প্রভৃতি। এসব অপচয় রোধ করে একদিকে যেমন জ্বালানির দীর্ঘসময় ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারি, অন্যদিকে তেমনি রাসায়নিক শক্তি ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব রোধ করতে পারি। রাসায়নিক শক্তি ব্যবহারের সচেনতাই পারে আমাদের পৃথিবীকে দীর্ঘসময় টিকিয়ে রাখতে।

৮.৫ জ্বালানি বিশুদ্ধতার গুরুত্ব

বিশুদ্ধ জ্বালানি (fuel) বলতে কী বুঝি? যা পোড়ানোর ফলে স্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক পদার্থ তৈরি হয় না, তাকে বিশুদ্ধ জ্বালানি বলা হয়। জ্বালানি বিশেষ করে কাঠ, প্রাকৃতিক গ্যাস ও পেট্রোলিয়াম পোড়ালে সাধারণত কার্বন–ডাই–অক্সাইড গ্যাস, পানি ও তাপ উৎপন্ন হয়। উদ্ভিদ সালোক–সংশ্লেষণ বিক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য কার্বন–ডাই–অক্সাইড গ্যাস শোষণ করে। অবশ্য স্বল্প বায়ুর উপস্থিতিতে এসব জ্বালানি পোড়ালে কার্বন–ডাই–অক্সাইডের সাথে বিষাক্ত কার্বন–মনো–অক্সাইডও উৎপন্ন হয়, যা স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ। অন্যদিকে, যদি জ্বালানির সাথে বিশেষ করে

সালফারও নাই ট্রোজেন মৌলযুক্ত যৌগ থাকে, তাহলে জ্বালানি পোড়ানোর সময় পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ সালফার ও নাইট্রোজেনের বিভিন্ন অক্সাইড উৎপন্ন হয়। সালফারডাইঅ ক্সাইড বায়ুর জলীয়বাষ্পের সাথে যুক্ত হয়ে সালফিউরিক এসিড তৈরি করে, যা এসিডবৃষ্টির (acid rain) সৃষ্টি করে। আমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারি যে, এসিডবৃষ্টি পরিবেশের গাছপালা ও জীবজন্তুর টিকে থাকার জন্য অন্তরায়। এছাড়াও যানবাহন থেকে নির্গত ধোঁয়ায় কার্বনম নোঅ ক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড ও অব্যবহৃত গ্যাসীয় জ্বালানি (মিথেন) বায়ুতে মিশে সূর্যের আলোর উপস্থিতিতে নানা রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষাক্ত গ্যাসের ধোঁয়ার সৃষ্টি করে। একে 'ফটোক্যামিক্যাল ধোঁয়া' (photochemical smog) বলে। ফটোক্যামিক্যাল ধোঁয়ার উপাদান গ্যাসসমূহ বায়ুমণ্ডলের ওজোন (O_3) স্তরের ক্ষমারাত্মক ক্ষয়সাধন করে। অতএব স্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষায় বিশুদ্ধ জ্বালানির ব্যবহার নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি।

৮.৬ রাসায়নিক শক্তি ব্যবহারের নেতিবাচক প্রভাব

আমরা উপরে দেখলাম যে, রাসায়নিক শক্তির ব্যবহার উপযোগী করার মূলনীতি মূলত জ্বালানিকে বায়ুর সাথে পুড়িয়ে (জারণ বিক্রিয়া) তাপ উৎপন্ন করা। যদিও ফুয়েল সেল ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বিশেষ করে বিভিন্ন তড়িৎ রাসায়নিক কোষ ও নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ায় রাসায়নিক শক্তি থেকে ব্যবহারযোগ্য শক্তির উৎপাদনের মূলনীতি ভিন্ন। প্রকৃতপক্ষে, সিংহভাগ শক্তিই জ্বালানিকে পুড়িয়েই উৎপাদন করা হয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে হাজার হাজার টন জ্বালানি পোড়ানোর ফলে উদ্ভূত সমতুল্য পরিমাণ CO_2 গ্যাস ও অন্যান্য গ্যাসসমূহ বিশেষ করে CO, SO_2, NO ও ধোঁয়ার সাথে বের হওয়া অদহনীয় জ্বালানি কোথায় যাচ্ছে? নিশ্চয়ই এরা বাতাসের সাথে মিশে যাচ্ছে। উল্লেখ্য যে, সালোকসংশ্লেষণ বিক্রিয়ায় বায়ুতে মিশে যাওয়া CO_2 গ্যাস ব্যবহৃত হয় বটে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে একদিকে আমরা উদ্ভিদকুলের নিধন করছি, অন্যদিকে আমাদের অত্যাধুনিক জীবনব্যবস্থার চাহিদা মেটানোর জন্য জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধি করছি। এতে করে দিনে দিনে বায়ুমণ্ডলে CO_2-এ র পরিমাণ অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাচ্ছে। যদিও CO_2 বায়ুর অন্য উপাদানের সাথে বিক্রিয়া করে না, তবে CO_2 গ্যাসের তাপ ধারণক্ষমতা বেশি, অর্থাৎ CO_2 তাপ শোষণ করে তা ধরে রাখতে পারে (trapping of heat) । আবার CO_2 গ্যাস ওজনে ভারী হওয়ায় পৃথিবীপৃষ্ঠের কাছাকাছি অবস্থান করে। এতে করে দিনে দিনে পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে, যাকে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন (global warming) বলা হয়। CO_2 গ্যাসের এ ধরনের তাপমাত্রা বৃদ্ধির ঘটনা 'গ্রিন হাউজ প্রভাব' (greenhouse effect) বলে পরিচিত এবং CO_2 -কে গ্রিনহাউজ গ্যাস বলা হয়। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে মেরুঅঞ্চলের বরফ গলে পানিতে পরিণত হয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত বন্যার সৃষ্টি করছে (চিত্র৮.৮)। অন ্যদিকে, জ্বালানি পোড়ানোর ফলে উদ্ভূত অন্যান্য গ্যাসসমূহ নানারকম রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে বায়ুকে দূষিত করছে এবং বায়ুতে বিভিন্ন উপাদানের ভারসাম্য নষ্ট করে এসিডবৃষ্টি ও ফটোক্যামিক্যাল ধোঁয়ার সৃষ্টি করছে। তাছাড়াও এসব গ্যাস ওজোনস্তরের সাথে সরাসরি বিক্রিয়া করে এর পুরুত্ব কমিয়ে দিচ্ছে বা ওজোনস্তরে ক্ষতের (hole) সৃষ্টি করছে। আসলে ওজোনস্তর সূর্যের আলোর ছাঁকনি হিসেবে কাজ করে সূর্যের আলোতে উপস্থিত অতিবেগুনি রশ্মি (ultraviolet ray) পৃথিবীতে আসতে বাধা প্রদান করে। পরবর্তী শ্রেণিতে আমরা এদের প্রভাবে কী কী হতে পারে তার বিস্তারিত জানব।



চিত্র–৮.৮: কারখানা থেকে কার্বন–ডাই–অক্সাইডের নিঃসরণ (বামে) ও বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে মেরু অঞ্চলের বরফ গলে পানি হচ্ছে (ডানে)।

৮.৭ ইথানলকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার

ইথানল, যার অপর নাম ইথাইল অ্যালকোহল– এটি একটি দাহ্য তরল রাসায়নিক পদার্থ। খনিজ জ্বালানি যেমন– কেরোসিন, পেট্রোল, ডিজেল প্রভৃতির মতো ইথানলকে পোড়ালে তাপ উৎপন্ন হয়। তাহলে খনিজ জ্বালানির মতো ইথানলকে তাপ ইঞ্জিনের জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে কলকারখানা, গাড়ি, বিমান, জাহাজ প্রভৃতি চালানো যেতে পারে। ব্রাজিল, উত্তর আমেরিকাসহ উন্নত দেশসমূহে ইথানলকে পেট্রোলিয়াম (খনিজ জ্বালানি) –এর সাথে মিশ্রিত করে তাপ ইঞ্জিনে ব্যবহার করা হয়। আমেরিকার মোটামুটি সব কারগাড়ি পেট্রোলের সাথে শতকরা 10 ভাগ ইথানলমিশ্রিত জ্বালানি ব্যবহার করে রাস্তায় চলাচল করছে। ব্রাজিলের সরকার খনিজ জ্বালানির সাথে শতকরা 25 ভাগ ইথালন মিশ্রিত করে ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক করেছে। এছাড়াও আধুনিককালের ও পরবর্তী প্রজন্মের ব্যবহারযোগ্য শক্তি উৎপাদনের প্রযুক্তি বলে খ্যাত 'ফুয়েল সেল' (fuel cell) –এর জ্বালানি হিসেবে অ্যালকোহল (মিথানল ও ইথানল) ব্যবহৃত হচ্ছে। নিশ্চয়ই এই প্রশ্নটা মনে জাগতে পারে, এত সব জ্বালানি থাকতে ইথানলের ব্যবহার দরকার কেন? বলা হচ্ছে যে, খনিজ জ্বালানির মজুদ একসময় শেষ হয়ে যাবে। তাহলে চিন্তা করা প্রয়োজন আমরা কীভাবে শক্তির উৎপাদন করব, কীভাবে যানবাহন বা কলকারখানা চালাব? এমতাবস্থায় যদি ইথালনকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা যায়, তাহলে অবশ্যই খনিজ জ্বালানির মজুদের উপর চাপ কম পড়বে।

মজার ব্যাপার হলো– ইথানল হলো একটি জৈব রাসায়নিক যৌগ, যা শ্বেতসার জাতীয় শস্য দানা যেমন– আলু, ভুট্টা, ইক্ষু প্রভৃতি থেকে গাজন প্রক্রিয়ার (fermentation reaction) মাধ্যমে উৎপন্ন করা যায়। এজন্য ইথানলকে জৈব জ্বালানি (bio-fuel) বলা হয়। অধুনা নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে সেলুলোজ (উদ্ভিদের দেহের উপাদান) থেকে ইথানল উৎপাদন করাও সম্ভব হয়েছে। অন্যদিকে, কৃষিকাজের মাধ্যমে শস্য ও উদ্ভিদ তথা ইথানলের নিয়মিতভাবে উৎপাদন নিশ্চিত করা সম্ভব। অতএব খনিজ জ্বালানির মতো ইথানল ফুরাবার ভয় নেই। তাহলে, ইথানলের বাণিজ্যিক উৎপাদন ও বিকল্প জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারের প্রযুক্তি উদ্ভাবন একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

৮.৮ তড়িৎ রাসায়নিক কোষ (Electrochemical Cell)

উপরে আমরা জানলাম যে, জ্বালানিকে পুড়িয়ে রাসায়নিক শক্তিকে তাপশক্তিতে পরিণত করে বিভিন্নভাবে কাজে লাগানো যায়। এখানে আমরা শিখব কীভাবে রাসায়নিক শক্তিকে তাপশক্তিতে রূপান্তরিত না করে সরাসরি বিদ্যুৎশক্তিতে পরিণত করা যায় ও পাশাপাশি কীভাবে বিদ্যুৎশক্তিকে ব্যবহার করে রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্পন্ন করা যায়। গ্যালভানি (Luigi

Galvani) ও ভোলটা (Alessandro Volta) প্রথম রাসায়নিক শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। গ্যালভানি 1780 খ্রিস্টাব্দে ও ভোলটা 1800 খ্রিস্টাব্দে আলাদাভাবে পরীক্ষার মাধ্যমে বুঝতে পারেন যে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটা জারণবিজারণ বি ক্রিয়ার (redox reaction) মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা সম্ভব। মূলত তাদের আবিষ্কারের ফলেই আজ আমরা ব্যাটারি পেয়েছি। তাহলে, গ্যালভানিক কোষ (Galvanic Cell) (যা ভোলটায়িক কোষ (Voltaic Cell) বলেও পরিচিত) হলো এক ধরনের তড়িৎ রাসায়নিক কোষ (electrochemical cell) যার মাধ্যমে রাসায়নিক শক্তি থেকে বিদ্যুৎশক্তি তৈরি করা যায়। অপরদিকে বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহার করে তড়িৎ রাসায়নিক কোষের মাধ্যমে রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত করা যায়। একে তড়িৎ বিশ্লেষণ (electrolysis) বলা হয়। যে কোষে তড়িৎ বিশ্লেষণ করা হয় তাকে তড়িৎ বিশ্লেষ্য কোষ (electrolytic cell) বলে। তড়িৎ রাসায়নিক কোষ বিভিন্ন ক্ষুদ্রাংশ, যেমন তড়িৎদ্বার (electrode), লবণ সেতু (salt brige) ও তড়িৎ বিশ্লেষ্য দ্রবণ নিয়ে গঠিত। নিম্নে তড়িৎ রাসায়নিক কোষের বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা করা হলো।

৮.৯ বিদ্যুৎ পরিবাহী ও তড়িৎদ্বার

পরিবাহী: যে সকল পদার্থের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে পারে, তাদেরকে বিদ্যুৎ পরিবাহী (conductor) বলে। আর যাদের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে পারে না, তাদেরকে অপরিবাহী (insulator) বলে। ধাতু, কার্বন, গ্রাফাইট, গলিত লবণ ও এসিড, ক্ষার ও লবণের দ্রবণ প্রভৃতি বিদ্যুৎ পরিবাহী হিসেবে কাজ করে। বিদ্যুৎ পরিবহনের কৌশলের (mechanism) উপর ভিত্তি করে পরিবাহীকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা: (১) ই লেকট্রনিক (electronic) ও (২) তড়িৎ বিশ্লেষ্য (electrolytic) পরিবাহী। যে সকল পরিবাহী ইলেকট্রন প্রবাহের মাধ্যমে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করে তাকে ইলেকট্রনিক পরিবাহী বলে। যেমন– সকল ধাতু ও গ্রাফাইট। বিদ্যুৎপ্রবাহ যদি পরিবাহীর আয়ন দ্বারা সাধিত হয়, ঐসব পরিবাহীকে তড়িৎ বিশ্লেষ্য পরিবাহী বলে। যেমন গলিত লবণ, এসিড, ক্ষার ও লবণের দ্রবণ।

তড়িৎদ্বার: তড়িৎদ্বার হলো ধাতব বা অধাতব বিদ্যুৎ পরিবাহী পদার্থ। এদেরকে ইলেকট্রনিক পরিবাহী বলা হয়। তড়িৎদ্বার তড়িৎ রাসায়নিক কোষের ইলেকট্রনিক পরিবাহী ও দ্রবণের (আয়নিক পরিবাহী) মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহের যোগসূত্র রক্ষা করে। তড়িৎ রাসায়নিক কোষ গঠনে দুটি তড়িৎদ্বার প্রয়োজন। একটিকে অ্যানোড তড়িৎদ্বার এবং অপরটিকে ক্যাথোড তড়িৎদ্বার বলে।

অ্যানোড তড়িৎদ্বারে– ১. জারণ বিক্রিয়া সম্পন্ন হয় ২. দ্রবণের অ্যানায়নের ইলেকট্রন ধাতব দণ্ডে (অ্যানোড) স্থানান্তরিত হয়।

ক্যাথোড তড়িৎদ্বারে– ১. বিজারণ বিক্রিয়া সম্পন্ন হয় ২. দ্রবণের ক্যাটায়ন কর্তৃক ধাতব দণ্ড (ক্যাথোড) থেকে ইলেকট্রন গ্রহণ করে।

তড়িৎ বিশ্লেষ্য কোষে অ্যানোড ও ক্যাথোড তড়িৎদ্বার হিসেবে ধাতব দণ্ড বা গ্রাফাইট দণ্ড ব্যবহার করা হয়। এই কোষে অ্যানোড ও ক্যাথোড তড়িৎদ্বার হিসেবে একই ধাতব দণ্ড অথবা ভিন্ন ধাতব দণ্ড ব্যবহার করা যায়। ধাতব দণ্ড শুধুমাত্র ইলেকট্রন পরিবাহীর কাজ করে, কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে না। তড়িৎবিশ্লেষ্য কোষে ব্যবহৃত ব্যাটারির ধনাত্মক প্রান্ত যে ধাতব দণ্ডের সাথে যুক্ত তা অ্যানোড হিসেবে এবং ঋণাত্মক প্রান্ত যে ধাতব দণ্ডের সাথে যুক্ত তা ক্যাথোড হিসেবে কাজ করে।

গ্যালভানিক কোষে অ্যানোড ও ক্যাথোড তড়িৎদ্বার গঠনের পদ্ধতি তড়িৎ বিশ্লেষ্য কোষ থেকে পৃথক। একটি ধাতব

দণ্ডকে ঐ ধাতুর তড়িৎবিশ্লেষ্য দ্রবণের মধ্যে স্থাপন করে তড়িৎদ্বার গঠন করা হয়। গ্যালভানিক কোষের অ্যানোড ও ক্যাথোড হিসেবে ভিন্ন ধাতব দণ্ডকে ব্যবহার করা হয় (একই ধাতব দণ্ডকে ভিন্ন ঘনমাত্রার তড়িৎ বিশ্লেষ্যের মধ্যে স্থাপন করে অ্যানোড ও ক্যাথোড গঠন করা যায়। এই সম্পর্কে পরবর্তী শ্রেণিতে জানবে)। গ্যালভানিক কোষের অ্যানোড ও ক্যাথোড নির্ধারিত হয় ধাতুর সক্রিয়তা দ্বারা। তড়িৎদ্বার হিসেবে ব্যবহৃত ধাতব দণ্ডদ্বয়ের মধ্যে অধিক সক্রিয় ধাতু অ্যানোড এবং কম সক্রিয় ধাতু ক্যাথোড হিসেবে কাজ করে।

ধাতু/ধাতব আয়ন তড়িৎদ্বার

বিভিন্ন প্রকারের তড়িৎদ্বার রয়েছে। তন্মধ্যে ধাতু/ধাতব আয়ন তড়িৎদ্বার অন্যতম। কোনো একটি ধাতু যদি উক্ত ধাতুর লবণের দ্রবণে ডুবানো থাকে, তাহলে তাকে ধাতু/ধাতু আয়ন তড়িৎদ্বার বলে– যেমন: কপার ধাতুর দণ্ড বা ধাতব পাত কপার সালফেটের জলীয় দ্রবণে ডুবানো থাকে, তাহলে তাকে কপার/কপার(II) বা $Cu|Cu^{2+}(aq)$ তড়িৎদ্বার বলে। অনুরূপভাবে, $Ag|Ag^{+}(aq)$ এবং $Zn|Zn^{2+}(aq)$ উল্লেখযোগ্য ধাতু/ধাতব আয়ন তড়িৎদ্বারের উদাহরণ।

তড়িৎদ্বার বিক্রিয়া

উপরে আমরা ধাতু/ধাতব আয়ন তড়িৎদ্বার সম্পর্কে জেনেছি। $Ag|Ag^{+}(aq)$ তড়িৎদ্বারটির বিক্রিয়াকে আমরা নিম্নোক্তভাবে লিখতে পারি।

$$Ag(s) \rightleftharpoons Ag^{+}(aq) + e^{-}$$

ধাতু/ধাতব আয়ন তড়িৎদ্বার বিক্রিয়া উভমুখী প্রকৃতির হয়ে থাকে। অর্থাৎ তড়িৎদ্বার বিক্রিয়ায় ধাতব Ag (s) ইলেকট্রন ত্যাগ করে $Ag^{+}(aq)$ আয়নে পরিণত হয়ে দ্রবণে দ্রবীভূত হয়। অন্যথায় দ্রবণের Ag^{+} (aq) আয়নকে যদি একটি ইলেকট্রন প্রদান করা যায়, তাহলে Ag^{+} (aq) আয়ন ধাতব Ag(s) এ পরিণত হবে।

তাহলে তড়িৎদ্বার বিক্রিয়া জারণ বা বিজারণ বিক্রিয়া। অর্থাৎ কোনো একটি তড়িৎদ্বার বিক্রিয়ায় ইলেকট্রনের আদান অথবা প্রদান ঘটে। কিন্তু আমরা জানি, জারণ্ববিজারণ যুগপৎ ঘ টে। যদি একটি তড়িৎদ্বার ইলেকট্রন প্রদান করে (জারণ) তাহলে উক্ত ইলেকট্রনটি গ্রহণ করার জন্য আরেকটি তড়িৎদ্বারের প্রয়োজন নয় কি? আসলে ঠিক তাই। তড়িৎ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় জন্য দুইটি তড়িৎদ্বার থাক্লে ক ্যাথোড ও অ্যানোড। তড়িৎ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় যে তড়িৎদ্বার তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থকে ইলেকট্রন প্রদান করে, তাকে ক্যাথোড বলে। আবার যে তড়িৎদ্বার তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ থেকে ইলেকট্রন গ্রহণ করে তাকে অ্যানোড বলে। তড়িৎদ্বার বিক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্ত হতে পারে। অন্যথায় তড়িৎদ্বারে বিদ্যুৎ প্রবাহের মাধ্যমে তড়িৎদ্বার বিক্রিয়া সম্পাদন করা যায়।

অ্যানোড বিক্রিয়া : $M \rightarrow M^{+} + e^{-}$

ক্যাথোড বিক্রিয়া : $X + e^{-} \rightarrow X^{-}$

৮.১০ গ্যালভানিক কোষ

যে তড়িৎ রাসায়নিক কোষে তড়িৎদ্বার বিক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটে, অর্থাৎ বিক্রিয়া সংঘটনের জন্য বাহির থেকে শক্তির দরকার হয় না এবং রাসায়নিক শক্তি বিদ্যুৎশক্তিতে পরিণত হয়, তাকে গ্যালভানিক কোষ বলে। ড্যানিয়াল কোষ (Daniel cell) একটি গ্যালভানিক কোষ ড্যানিয়াল কোষ ক্যাথোড হিসেবে $Cu|Cu^{2+}(aq)$ ধাতু/ধাতব আয়ন তড়িৎদ্বার ও অ্যানোড হিসেবে $Zn|Zn^{2+}(aq)$ ধাতু/ধাতব আয়ন তড়িৎদ্বার নিয়ে গঠিত। চিত্রে ৮.৯এ ড ্যানিয়াল কোষের গঠন দেখানো হলো। ক্যাথোড হিসেবে একটি পাত্রে কপার দণ্ড কপার সালফেটের জলীয় দ্রবণে ডুবানো থাকে।

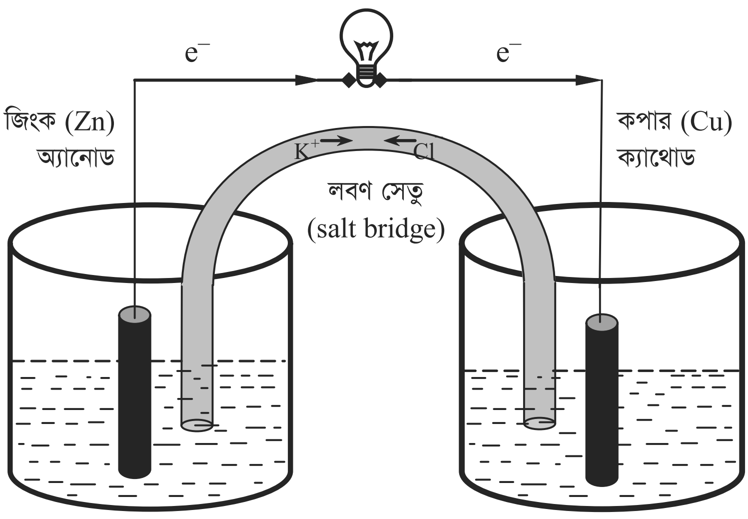
অন্য পাত্রে অ্যানোড হিসেবে জিংক দন্ড জিংক সালফেটের জলীয় দ্রবণে ডুবানো থাকে। পাত্রদ্বয়ের দ্রবণের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য নিষ্ক্রিয় তড়িৎ বিশ্লেষ্য (KCl) দ্রবণপূর্ণ U-আকৃতির টিউব দ্রবণদ্বয়ের মধ্যে ডুবানো হয়। এবার যদি তারের সাহায্যে তড়িৎদ্বার দুটিকে সংযুক্ত করা হয়, তাহলে নিম্নোক্ত জারণবিজারণ বি ক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটবে।

অ্যানোড বিক্রিয়া : $Zn (s) \rightarrow Zn^{2+} (aq) + 2e^{-}$

ক্যাথোড বিক্রিয়া : $Cu^{2+} (aq) + 2e^{-} \rightarrow Cu (s)$

$$Zn(s) + Cu^{2+} (aq) \rightarrow Zn^{2+}(aq) + Cu (s)$$

অর্থাৎ Zn অ্যানোড নিজে ইলেকট্রন ছেড়ে বিযোজিত (dissolution) হয়ে দ্রবণে $Zn^{2+}(aq)$ আয়ন হিসেবে দ্রবীভূত হবে। অপরদিকে, দ্রবণ হতে $Cu^{2+}(aq)$ আয়ন ক্যাথোড থেকে ইলেকট্রন গ্রহণ করে ধাতব Cu হিসেবে ক্যাথোড জমা হবে। প্রকৃতপক্ষে, অ্যানোডে উৎপন্ন ইলেকট্রন তারের মাধ্যমে ক্যাথোডে পৌঁছে ইলেকট্রনের সমতা রক্ষা করে। তাহলে তার দিয়ে তড়িৎদ্বার দুটিকে সংযুক্ত করলেই অ্যানোড থেকে ক্যাথোডে ইলেকট্রন প্রবাহের সৃষ্টি হবে। ইলেকট্রন প্রবাহ মানেই বিদ্যুৎপ্রবাহ। তাহলে আমরা বুঝলাম, যদি ড্যানিয়াল কোষের বাইরের তারের সাথে বৈদ্যুতিক বাল্ব যুক্ত করা হয়, তাহলে বাল্বটি জ্বলে উঠবে। এবার ভেবে দেখ, উল্লেখিত বিদ্যুৎপ্রবাহ কতক্ষণ চলবে? তাছাড়াও কোষ বিক্রিয়া শেষে ভরের দিক থেকে জিংক ও কপার দণ্ডের অবস্থা কী হবে? নিজেরা চিন্তা করে বের কর ও খাতায় লেখ।



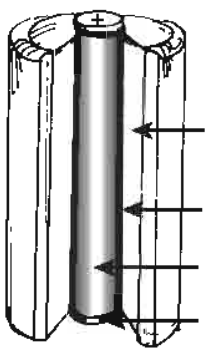
চিত্র-৮.৯: গ্যালাভানিক কোষ।

চল এবার লবণ সেতুর কার্য ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করি। আমরা দেখলাম যে, অ্যানোডে $Zn^{2+}(aq)$ আয়ন তৈরি হয়ে দ্রবণে যায়। অপরদিকে, ক্যাথোডে দ্রবণ থেকে $Cu^{2+}(aq)$ আয়ন Cu হিসেবে জমা হয়। তাহলে, অ্যানোড পাত্রে $Zn^{2+}(aq)$ আয়নের আধিক্য হয় ও ক্যাথোড পাত্রে $Cu^{2+}(aq)$ আয়নের ঘাটতি হয়। আমরা জানি যে, কোনো একটি বিশেষ আয়ন (ধনাত্মক বা ঋণাত্মক) একা থাকতে পারে না। অর্থাৎ একটি ধনাত্মক আয়ন একটি ঋণাত্মক আয়নের উপস্থিতি ছাড়া তৈরি হয় না। উল্টোটিও ঠিক। সুতরাং অ্যানোড পাত্রে উৎপন্ন $Zn^{2+}(aq)$ আয়নের সমতুল্য পরিমাণ ঋণাত্মক আয়নের (সালফেট আয়ন) প্রয়োজন হবে। অন্যদিকে, ক্যাথোড পাত্রের দ্রবণ থেকে $Cu^{2+}(aq)$ আয়ন Cu

হিসেবে জমা হওয়ার ফলে সমতুল্য পরিমাণ ঋণাত্মক আয়ন (সালফেট আয়ন) মুক্ত হবে। ফলে একদিকে অ্যানোড পাত্রে ধনাত্মক আয়ন $\{Zn^{2+}(aq)\}$, অপরদিকে ক্যাথোড পাত্রে ঋণাত্মক আয়নের (সালফেট) আধিক্য ঘটবে। প্রকৃতপক্ষে, দুই পাত্রের মধ্যে আয়নের সমতা বজায় না থাকলে বিক্রিয়া ঘটবে না। কাজেই, লবণ–সেতু যুক্ত করলে তন্মধ্যে অবস্থিত ধনাত্মক $\{K^+(aq)\}$ ও ঋণাত্মক $\{Cl^-(aq)\}$ আয়নের সাহায্যে ক্যাথোড ও অ্যানোড–পাত্রে উল্লেখিত আয়নের অসমতা দূরীভূত হয়।

৮.১১ ড্রাই সেলের গঠন ও ইলেকট্রন স্থানান্তরের কৌশল

ড্রাই সেল (কোষ) এক ধরনের গ্যালভানিক কোষ (চিত্র–৮.১০)। প্রচলিতভাবে আমরা ড্রাই সেলকে ব্যাটারি বলে থাকি। উপরে আমরা তড়িৎ রাসায়নিক কোষ তথা গ্যালভানিক কোষ সম্পর্কে জেনেছি। ড্রাই সেলের মাধ্যমে রাসায়নিক শক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তর করা হয়। সর্বাধিক পরিচিত ড্রাই সেল হলো– লেক্লেন্স সেল (*Leclanché cell*)। ড্রাই সেল আমরা সাধারণত টর্চলাইট জ্বালাতে, রেডিও বাজাতে, টিভির রিমোট চালাতে, বাচ্চাদের খেলনা চালাতে প্রভৃতি কাজে ব্যবহার করি। গ্যালভানিক কোষের ন্যায় ড্রাই সেলও অ্যানোড ও ক্যাথোড দ্বারা গঠিত। তফাৎ হলো ড্রাই সেল গঠনে কোন তরল তড়িৎ বিশ্লেষ্য দ্রব (electrolyte) থাকে না। চল এবার ড্রাই সেলের গঠন ও এতে ইলেকট্রন প্রবাহ সৃষ্টি তথা বিদ্যুৎ উৎপন্ন হওয়ার কৌশল নিয়ে আলোচনা করি।



চিত্র–৮.১০: ড্রাই সেল

ড্রাই সেলের অ্যানোড হিসেবে সাধারণত ধাতব জিংকের তৈরি ছোট জার (কৌটা) ব্যবহার করা হয়। উক্ত কৌটাটি ম্যাঙ্গানিজ–ডাই–অক্সাইড (MnO_2) ও তড়িৎ বিশ্লেষ্য দ্রব দ্বারা পূর্ণ করা হয়। তড়িৎ বিশ্লেষ্য দ্রব হিসেবে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড (NH_4Cl) ও জিংক ক্লোরাইড ($ZnCl_2$) মিশ্রিত করে পানি দিয়ে কাই (paste) তৈরি করা হয়। প্রাপ্ত কাইকে ঘন করার জন্য স্টার্চ (starch) যুক্ত করা হয়। এরপর জিংকের কৌটাটি কাই দ্বারা পূর্ণ করে তার ঠিক মাঝখানে ক্যাথোড দণ্ড প্রবেশ করানো হয়। ক্যাথোড হিসেবে ম্যাঙ্গানিজ–ডাই–অক্সাইড এর ভারী আবরণযুক্ত কার্বন দণ্ড ব্যবহার করা হয়। ড্রাই সেলের যদি ব্যবচ্ছেদ করা হয়, তাহলে আমরা সেলের কেন্দ্রে কার্বন দণ্ড, তার উপর ম্যাঙ্গানিজ–ডাই–অক্সাইডের আবরণ, এরপর পানি দিয়ে তৈরি স্টার্চ, অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ও জিংক ক্লোরাইডের ঘন কাই এবং সর্ববাইরে ধাতব জিংকের পাত দেখতে পাব।

আমরা জানি, ইলেকট্রন প্রবাহের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, আর ইলেকট্রন আদান–প্রদানের (জারণ–বিজারণ) ফলে ইলেকট্রন প্রবাহের সৃষ্টি করা যায়। চল ড্রাই সেলের অ্যানোডে ইলেকট্রনের উৎপাদন ও ক্যাথোডে গ্রহণের কৌশল নিচে দেখি।

অ্যানোড বিক্রিয়া : $Zn(s) \rightarrow Zn^{2+}(aq) + 2e^-$

ক্যাথোড বিক্রিয়া : $2NH_4^+(aq) + 2MnO_2(s) + 2e^- \rightarrow 2NH_3(aq) + Mn_2O_3(s) + H_2O(l)$

$$Zn(s) + 2NH_4^+(aq) + 2MnO_2(s) \rightarrow Zn^{2+}(aq) + 2NH_3(aq) + Mn_2O_3(s) + H_2O(l)$$

অ্যানোডে জিংক দণ্ড বিজারিত হয়ে 2টি ইলেকট্রন ও জিংক আয়ন উৎপন্ন করে। উৎপন্ন জিংক আয়ন কাইয়ের সাথে মিশে যাবে। অন্যদিকে, ক্যাথোডে অবস্থিত ম্যাঙ্গানিজ–ডাই–অক্সাইড অ্যানোডে উৎপন্ন ইলেকট্রন গ্রহণ করে জারিত হয়। অ্যামোনিয়াম আয়ন ম্যাঙ্গানিজ–ডাই–অক্সাইডের জারণ বিক্রিয়া সম্পন্ন হতে সহায়তা করে মাত্র। কার্বন দণ্ড অ্যানোডে উৎপন্ন ইলেকট্রন ক্যাথোডে সরবরাহ করে। আমরা জানি, ইলেকট্রনের প্রবাহ সৃষ্টি মানেই বিদ্যুতের উৎপাদন, তাহলে যেখানে বিদ্যুৎ প্রয়োজন সেখানে ড্রাই সেল সংযুক্ত করলেই উল্লেখিত বিক্রিয়াসমূহ সংঘটিত হবে এবং আমরা বিদ্যুৎশক্তি পাব। ড্রাই সেল থেকে 1.5 ভোল্ট তড়িৎ বিভব পাওয়া যায়।

আমরা দেখি যে, একটি ড্রাই সেল কিছুদিন পর আর কাজ করে না, অর্থাৎ বিদ্যুৎশক্তি দেয় না। উপরের আলোচনা থেকে ভেবে দেখ, কেন এমন হয়? চল নিচের ছকটি (ছক–৮.১) পূরণ করি।

সেলের উপাদান	ব্যবহারের পরের অবস্থা	মন্তব্য
কার্বন দণ্ড	জারিত বা বিজারিত হবে না	ক্ষয় বা বৃদ্ধি হবে না। শুধুমাত্র ইলেকট্রন প্রবাহে অংশগ্রহণ করে
জিংক অ্যানোড		
ম্যাঙ্গানিজ–ডাই–অক্সাইডের আবরণ		
অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড		
পানি		
জিংক ক্লোরাইড		
স্টার্চ		

ছক–৮.১: ব্যবহারের পরে ড্রাই সেলের বিভিন্ন অংশের অবস্থা

শিক্ষার্থীরা সবাই মিলে একটি পুরাতন ও একটি নতুন ড্রাই সেল নিয়ে পরীক্ষা করে উপরের ছকের উত্তরের সাথে মিলিয়ে দেখ। সাবধান! কোনভাবেই ড্রাই সেলের ভিতরের রাসায়নিক দ্রব্যাদি শরীরের কোথাও লাগতে দেওয়া যাবে না। কাজটি করার সময় প্রয়োজনে হ্যান্ডগ্লাভস ব্যাগ হাতে লাগাও।

৮.১২ স্বাস্থ্য ও পরিবেশের উপর ব্যাটারির প্রভাব

আমরা বিভিন্ন ধরনের ব্যাটারি ব্যবহার করে থাকি যেমন– ড্রাই সেল (dry cell), মারকারি কোষ (mercury battery), লেড–স্টোরেজ (lead-storage battery) ও লিথিয়াম (lithium ion battery) ব্যাটারি। এসব ব্যাটারি বিভিন্ন ধাতু ও ধাতব আয়নের সমন্বয়ে তৈরি। উপরে দেখেছি যে, ড্রাই সেল গঠনে দস্তা (Zn) দণ্ড ও MnO_2 ব্যবহার করা হয়। মারকারি কোষে Zn ও মারকিউরাস অক্সাইড (Hg_2O) ব্যবহার হয়। আবার লেড–স্টোরেজ ব্যাটারি, যাকে আমরা সচরাচর মাইক চালানোর কাজে ব্যবহৃত হতে দেখি, মূলত সিসা (Pb) ও সিসার অক্সাইড (PbO_2) দ্বারা তৈরি। লিথিয়াম ব্যাটারিতে কোবাল্ট অক্সাইড (CoO_2) ব্যবহার করা হয়। উল্লিখিত ধাতুসমূহকে ভারী ধাতু (heavy metal) বলে। রাসায়নিক ধর্মের বিবেচনায় ব্যাটারিতে ব্যবহৃত এসব ভারী ধাতু এবং ধাতব যৌগসমূহ বিষাক্ত (toxic) ও জীবদেহে ক্যান্সার সৃষ্টিকারী (carcinogenic) হিসেবে পরিচিত। তাহলে ব্যাটারি ব্যবহারের পর ফেলে দিলে এসব

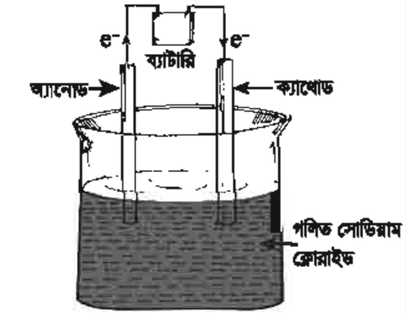
ক্ষতিকারক ধাতু ও ধাতব যৌগসমূহ মাটি ও পানির সাথে যুক্ত হয়। পরবর্তীতে তারা মাটিতে মিশে উদ্ভিদ ও ফসলে চলে আসে। অনুরূপভাবে, পানিতে জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহেও এসব ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থ প্রবেশ করে। এভাবে ব্যাটারিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থ মাটি ও পানির ধাতব পদার্থের ভারসাম্য নষ্ট করে এবং আমাদের খাদ্য–শিকল (food chain)–এ প্রবেশ করে। ব্যাটারির বর্জ্য দ্বারা দূষিত মাটি ও পানিতে জন্মানো খাদ্য গ্রহণ করলে ক্যান্সারসহ নানা জটিল রোগের সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং ব্যাটারির বর্জ্য কোনোভাবেই পরিবেশে ফেলা উচিত নয়। বরং ব্যাটারির বর্জ্য সংগ্রহ করে যথাযথ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যবহৃত ধাতু ও ধাতব যৌগসমূহ পুনরুদ্ধার (recover) করে চক্রাকার (cyclic order)–এ নতুন ব্যাটারি তৈরিতে ব্যবহার করা যেতে পারে। এর ফলে পরিবেশ তথা স্বাস্থ্যরক্ষা ও অর্থসাশ্রয় উভয়েই সম্ভব।

৮.১৩ বিদ্যুৎ ব্যবহার করে বিক্রিয়া সংগঠন

আমরা দেখেছি যে, গ্যালভানিক কোষ যেমন– ড্যানিয়াল কোষ, ড্রাই সেল ব্যাটারির ক্ষেত্রে অ্যানোড ও ক্যাথোড তড়িৎদ্বার বিক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটে রাসায়নিক শক্তি থেকে বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হয়। কিন্তু স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটে না এরকম অনেক বিক্রিয়াই তড়িৎ রাসায়নিক কোষে বাহির থেকে বিদ্যুৎপ্রবাহের মাধ্যমে সংঘটিত করা যায়। সহজভাবে বলতে গেলে, যেমন গ্যালভানিক কোষে বিদ্যুৎশক্তি তৈরির ফলে কোষেসংযুক্ত বাল্ব জ্বলে, অপরদিকে এ ধরনের কোষে বাল্বের পরিবর্তে উল্টো বিদ্যুৎশক্তির উৎস (ব্যাটারি) যুক্ত করতে হয়। যে কোষে বিদ্যুৎশক্তিকে ব্যবহার করে তড়িৎদ্বার বিক্রিয়া সংঘটিত করা হয়, তাকে তড়িৎ বিশ্লেষ্য কোষ (electrolytic cell) বলে। তড়িৎ বিশ্লেষ্য কোষে বিদ্যুৎশক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। তড়িৎ বিশ্লেষণের সাহায্যে ধাতুপ্রলেপ (electroplating) দেওয়া, ধাতু পরিশোধন করা, নতুন রাসায়নিক পদার্থের উৎপাদন করা প্রভৃতি সম্ভব।

৮.১৪ তড়িৎ বিশ্লেষণ ও তড়িৎ বিশ্লেষ্যের বিশ্লিষ্ট হওয়ার কৌশল

তড়িৎ বিশ্লেষ্য কোষের গঠন গ্যালভানিক কোষের মতোই, তবে এক্ষেত্রে কোষ গঠনে বিদ্যুৎ গ্রহণকারীর (যেমন– বৈদ্যুতিক বাল্ব) পরিবর্তে কোষে বিদ্যুৎ সরবরাহকারী হিসেবে বিদ্যুতের উৎস (যেমন– ব্যাটারি) যুক্ত থাকে। তড়িৎ বিশ্লেষ্য কোষ এক প্রকোষ্ঠ (one-compartment) বা দুই প্রকোষ্ঠ (two-compartment) বিশিষ্ট হতে পারে। দুই প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট তড়িৎ বিশ্লেষ্য কোষের গঠন ড্যানিয়াল কোষের মতো। চিত্রে একটি এক প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট তড়িৎ বিশ্লেষ্য কোষ দেখানো হলো। কোষের মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালালে একটি ধনাত্মক পোল তড়িৎদ্বার (অ্যানোড) ও অপরটি ঋণাত্মক পোল তড়িৎদ্বার (ক্যাথোড) –এর সৃষ্টি হয়। এর ফলে তড়িৎ বিশ্লেষ্য দ্রবণে উপস্থিত আয়নসমূহ তাদের চার্জ অনুসারে তড়িৎদ্বারে আকৃষ্ট হয়, অর্থাৎ ঋণাত্মক চার্জযুক্ত আয়ন অ্যানোড ও ধনাত্মক চার্জযুক্ত আয়ন ক্যাথোড দ্বারা আকৃষ্ট হবে। ঋণাত্মক আয়ন অ্যানোড ইলেকট্রন প্রদান (জারণ) করে নতুন পদার্থে পরিণত হয়। অপরদিকে, ধনাত্মক আয়ন ক্যাথোড থেকে ইলেকট্রন গ্রহণ (বিজারণ) করে নতুন পদার্থে রূপান্তরিত হয়। এভাবে তড়িৎ বিশ্লেষ্য কোষ অ্যানোডে জারণ বিক্রিয়ায় সৃষ্ট ইলেকট্রন কোষের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ক্যাথোডের বিজারণ বিক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ইলেকট্রনের চাহিদা মেটায়।



অ্যানোড বিক্রিয়া: $2Cl^- \rightarrow Cl_2\,(g) + 2e^-$

ক্যাথোড বিক্রিয়া: $2Na^+ + 2e^- \rightarrow 2Na(l)$

চিত্র-৮.১১: তড়িৎ বিশ্লেষ্য কোষ।

অ্যানোড বিক্রিয়া : $X^{-} \rightarrow X + e^{-}$
ক্যাথোড বিক্রিয়া : $M^{+} + e^{-} \rightarrow M$

এখানে বলে রাখা দরকার যে, কোষে বিদ্যুৎপ্রবাহের ফলে শুধুমাত্র যে, চার্জযুক্ত আয়ন আকৃষ্ট হয়, তা ঠিক নয়। দ্রবণে উপস্থিত চার্জবিহীন যৌগও তাদের জারিত বা বিজারিত হওয়ার প্রবণতার উপর ভিত্তি করে অ্যানোড বা ক্যাথোড দ্বারা আকৃষ্ট হতে পারে। মোটকথা তড়িৎ বিশ্লেষ্য কোষ আয়নের ন্যায় চার্জবিহীন যৌগেরও জারণ–বিজারণ বিক্রিয়া সম্পাদন করা সম্ভব। এখন তড়িৎ বিশ্লেষ্য কোষের বাস্তবে ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করা যাক।

৮.১৫ তড়িৎ বিশ্লেষণের প্রয়োগ

প্রাচীনকালে যদিও তড়িৎ বিশ্লেষণের কৌশল প্রয়োগ করে শুধুমাত্র এক ধাতুর উপর অন্য ধাতুর প্রলেপ দেওয়া হতো, কিন্তু আধুনিককালে তড়িৎ বিশ্লেষণের ব্যবহার ব্যাপক। তড়িৎ বিশ্লেষণের সাহায্যে কোনো ধাতুর উপর অন্য ধাতুর প্রলেপ দেওয়ার প্রক্রিয়াকে ইলেকট্রোপ্লেটিং (electroplating) বলা হয়। আধুনিক রসায়নে তড়িৎ বিশ্লেষণ কৌশলের মাধ্যমে নতুন পদার্থের উৎপাদন, আকরিক থেকে ধাতুর নিষ্কাশন (extraction), বিদ্যুৎশক্তির উৎপাদন (ফুয়েল সেল), পরীক্ষাগারে রাসায়নিক পদার্থের বিশ্লেষণ (analysis), পদার্থের পরিশোধন (re-cycling) ও বিশুদ্ধিকরণ (purification), পরিবেশ দূষণকারী পদার্থের ব্যবস্থাপনাকরণ (pollutant management) ইত্যাদি করা হয়। চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যবহৃত কিছু কিছু যন্ত্রপাতির কৌশলও তড়িৎ বিশ্লেষণ নির্ভর।



চিত্র–৮.১২: ফুয়েল সেল দ্বারা চালিত বাস।

তড়িৎ বিশ্লেষণ কৌশল ব্যবহার করে লোহা বা রুপার উপর সোনার প্রলেপ দেওয়া যায়। তড়িৎ বিশ্লেষণ কৌশল ব্যবহার করে পানিকে অপ্রয়োজনীয় আয়নমুক্ত করে বিশুদ্ধ করা যায়। হাইড্রোজেন ফুয়েল সেলের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয় যেখানে– অ্যানোডে হাইড্রোজেন অণু জারিত হয়, আর ক্যাথোডে অক্সিজেন অণু বিজারিত হয়ে পানি উৎপন্ন করে। ফলে কোষে ইলেকট্রন অ্যানোড হতে ক্যাথোডে প্রবাহিত হয় এবং আমরা বিদ্যুৎ পাই। উক্ত বিদ্যুতের সাহায্যে গাড়ি পর্যন্ত চলাচল করতে পারে (চিত্র–৮.১২)। পরীক্ষাগারে তড়িৎ বিশ্লেষ্য কোষের মাধ্যমে বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে কোনো কিছুর পরিমাণ নির্ণয় করা যায়, যেমন পানিতে আর্সেনিকের পরিমাণ নির্ণয়। তড়িৎ বিশ্লেষ্য কোষে বর্জ্যকে পরিশোধণ করে পরিবেশ রক্ষা করা যায়। ডায়াবেটিক রোগীর রক্তের মধ্যে গ্লুকোজের পরিমাণ নির্ণয় করার জন্য তড়িৎ বিশ্লেষণ কৌশল নির্ভর সেন্সর (sensor) ব্যবহার করা হয়।


চিত্র–৮.১৩:তড়িৎ রাসায়নিক গ্লুকোজ সেন্সর।

চিত্রে তড়িৎ বিশ্লেষণ কৌশল ব্যবহার করে মানবদেহে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ নির্ণয় দেখানো হলো (চিত্র–৮.১৩)। বাম হাতের আঙ্গুলে লাগানো ছোট অংশটিতে পাতলা ও চিকন অ্যানোড ও ক্যাথোড বসানো আছে। প্রকৃতপক্ষে, অ্যানোড ও ক্যাথোড

প্লাস্টিকের উপর ধাতুর পাতলা আবরণ, যা স্ক্রিনপ্রিন্টিং প্রযুক্তির মাধ্যমে তৈরি করা হয়। অ্যানোড ও ক্যাথোডের মাঝখানে একটা ছোট ফাঁকা নালী (channel) থাকে। ডান হাতের মোটা অংশটি মূলত বিদ্যুৎপ্রবাহের উৎস (ব্যাটারি) ও তড়িৎপ্রবাহের ফলে উদ্ভূত বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী অণুর হিসাব–নিকাশ করার যন্ত্রবিশেষ নিয়ে গঠিত। তাহলে উল্লিখিত হিসাব–নিকাশ করার যন্ত্রাংশটি বাদ দিলে উপরে বর্ণিত বাকি অংশগুলো হলো– অ্যানোড ও ক্যাথোড তড়িৎ–উৎসের সাথে যুক্ত। এবার প্রাপ্ত অংশগুলোকে একটি তড়িৎ বিশ্লেষ্য কোষের সাথে তুলনা করলে দেখব যে, তড়িৎ বিশ্লেষ্য কোষ গঠনের জন্য শুধুমাত্র তড়িৎ বিশ্লেষ্য দ্রবণ অনুপস্থিত। তাই নয় কি? আমরা জানি, মানবদেহের রক্তে বিভিন্ন রকমের তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ যেমন– আয়ন, প্রোটন ইত্যাদি থাকে। যদি অ্যানোড ও ক্যাথোডের মাঝখানে ফাঁকা নালীতে রক্ত দেওয়া হয়, তাহলে একটি পূর্ণ তড়িৎ কোষ গঠিত হবে। আসলে, ফাঁকা নালীতে রক্ত দিলে কোষে সংযুক্ত উৎস হতে তড়িৎ প্রবাহিত হয়ে অ্যানোডে রক্তে অবস্থিত গ্লুকোজ অণু জারিত হয়। অন্যদিকে, যন্ত্রে অবস্থিত হিসাব–নিকাশ করার যন্ত্রের সাহায্যে গ্লুকোজের জারণের ফলে উদ্ভূত ইলেকট্রনের সংখ্যা নির্ণয় করে যন্ত্রটি তার পর্দায় (screen) রক্তে অবস্থিত গ্লুকোজের পরিমাণ যন্ত্রের মনিটরে ডিজিটের (digit) সাহায্যে প্রকাশ করে। মজার ব্যাপার হলো, এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে রক্তের গ্লুকোজের পরিমাণ নির্ণয় করতে এক মিনিট সময়ই যথেষ্ট।

৮.১৬ পানির তড়িৎ বিশ্লেষণ

আমরা জানি, পানির অণু ২টি হাইড্রোজেন ও ১টি অক্সিজেন মৌলের পরমাণু দ্বারা গঠিত। পানি গঠনের রাসায়নিক বিক্রিয়া নিচে দেখানো হলো।

$$H_2\,(g) + \tfrac{1}{2}\,O_2\,(g) \rightarrow H_2O\,(l) + \text{তাপ}$$

এক অণু হাইড্রোজেন ও অর্ধ অণু অক্সিজেন মিলে এক অণু পানি উৎপন্ন হয়। তাহলে পানির অণুকে ভাঙলে বিপরীত বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস পাওয়া যায়।

$$2H_2O\,(l) \rightarrow 2H_2\,(g) + O_2\,(g)$$

উক্ত বিক্রিয়াটি স্বতঃস্ফূর্ত (spontaneous) নয়, অর্থাৎ বিক্রিয়াটি সংঘটিত করার জন্য শক্তি দিতে হয়। তড়িৎ রাসায়নিক কোষের (electrochemical cell) মাধ্যমে পানিকে ভাঙা যায়। পানির বিশ্লেষণের জন্য যে তড়িৎ রাসায়নিক কোষ ব্যবহৃত হয়, তাতে রাসায়নিকভাবে নিষ্ক্রিয় ধাতুর অ্যানোড ও ক্যাথোড ব্যবহার করা হয়। সাধারণত ধাতব প্লাটিনামের (Pt) পাত অ্যানোড ও ক্যাথোড হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সালফিউরিক এসিড দ্বারা সামান্য অম্লীয় পানির দ্রবণ তৈরি করে তাতে প্লাটিনাম অ্যানোড ও ক্যাথোডের মাধ্যমে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করলে নিম্নোক্ত অর্ধকোষ বিক্রিয়া সংঘটিত হয়।

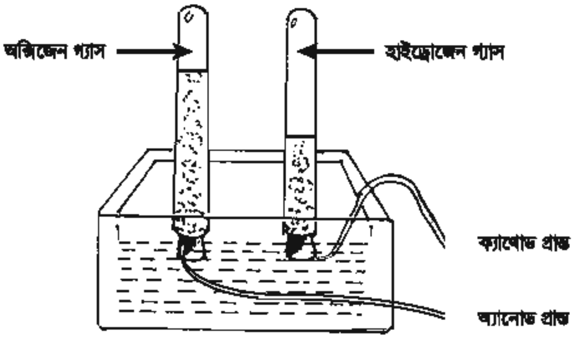
অ্যানোড বিক্রিয়া : $2H_2O\,(l) \rightarrow O_2\,(g) + 4H^+\,(aq) + 4e^-$

ক্যাথোড বিক্রিয়া : $4\,H^+\,(aq) + 4\,e^- \rightarrow 2\,H_2\,(g)$

$$2H_2O_{(l)} \rightarrow 2H_{2(g)} + O_{2\,(g)}$$

অ্যানোডে পানির অণু জারিত হয়ে অক্সিজেন গ্যাস, হাইড্রোজেন আয়ন (প্রোটন) ও ইলেকট্রন তৈরি করে। অন্যদিকে, ক্যাথোডে হাইড্রোজেন আয়ন বিজারিত হয়ে হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়। প্রকৃতপক্ষে, অ্যানোডে উৎপন্ন হাইড্রোজেন আয়ন দ্রবণের মধ্য দিয়ে ও ইলেকট্রন তারের মাধ্যমে ক্যাথোডে পৌঁছায়। এখানে উল্লেখ্য যে, বিক্রিয়ায় সালফিউরিক

এসিডের কোনো পরিবর্তন বা ব্যয় হয় না। আসলে সালফিউরিক এসিড শুধু দ্রবণের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ পরিবাহিতার কাজ করে।



চিত্র–৮.১৪: পানির তড়িৎ বিশ্লেষণ।

৮.১৭ সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণের তড়িৎ বিশ্লেষণ

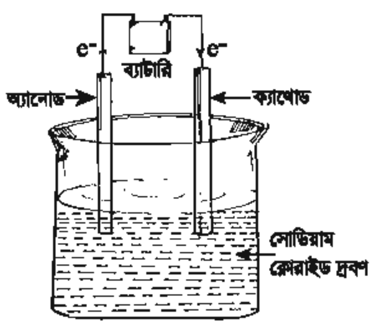
সোডিয়াম ক্লোরাইডের সম্পৃক্ত জলীয় দ্রবণকে ব্রাইন (brine) বলে। সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণকে তড়িৎ বিশ্লেষণ করে প্রধানত ক্লোরিন গ্যাস উৎপন্ন করা হয়। বাণিজ্যিকভাবে ক্লোরিন উৎপাদনের জন্য সমুদ্রের পানিকে তড়িৎ বিশ্লেষণ করা হয়। এক্ষেত্রে সমুদ্রের পানিকে সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়, কেননা সমুদ্রের পানিতে প্রচুর পরিমাণে লবণ থাকে। তড়িৎ বিশ্লেষণ করার জন্য যথারীতি অ্যানোড ও ক্যাথোড লবণাক্ত পানিতে ডুবিয়ে তাতে বিদ্যুৎ প্রবাহ দেওয়া হয়। উল্লেখ্য যে, সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণে বিদ্যুৎপ্রবাহের ফলে অ্যানোড ও ক্যাথোডে বিক্রিয়া কিছুটা জটিল। যেহেতু পানি নিজেও তড়িৎ বিশ্লেষ্য সেজন্য সোডিয়াম ক্লোরাইডের জলীয় দ্রবণে বিদ্যুৎপ্রবাহ চলালে সোডিয়াম ক্লোরাইডের সাথে পানিরও জারণ–বিজারণ ঘটে। পরবর্তীতে তোমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পারবে। নিম্নে অ্যানোড ও ক্যাথোডে সংঘটিত প্রধান জারণ–বিজারণ বিক্রিয়ার আলোচনা করা হলো।

অ্যানোড বিক্রিয়া : $2Cl^{-}(aq) \rightarrow Cl_2(g) + 2e^{-}$

ক্যাথোড বিক্রিয়া : $2H_2O(l) + 2e^{-} \rightarrow H_2(g) + OH^{-}(aq)$

$$2H_2O(l) + 2Cl^{-}(aq) \rightarrow H_2(g) + Cl_2(g) + 2OH^{-}(aq)$$

পানির তড়িৎ বিশ্লেষণে দ্রবণের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ পরিবহনের জন্য যেমন সালফিউরিক এসিড ব্যবহার করা হয়, এক্ষেত্রে সেরকম কিছু যুক্ত করার দরকার পড়ে না। কারণ সোডিয়াম ক্লোরাইডের দ্রবণে উপস্থিত সোডিয়াম আয়ন (Na^{+}) ও ক্লোরাইড আয়ন (Cl^{-}) বিদ্যুৎ পরিবাহিতার কাজ করে। বিদ্যুৎ প্রবাহিত করলে অ্যানোডে ক্লোরাইড আয়ন জারিত হয়ে ক্লোরিন গ্যাস ও ইলেকট্রন তৈরি হয়। অন্যদিকে, ক্যাথোডে পানির অণু বিজারিত হয়ে হাইড্রোক্সিল আয়ন (OH^{-}) ও হাইড্রোজেন গ্যাসে পরিণত হয়। প্রকৃতপক্ষে, অ্যানোডে উৎপন্ন ইলেকট্রন তারের মাধ্যমে ক্যাথোডে পৌঁছায় ও ক্যাথোডে পানির বিজারণের জন্য প্রয়োজনীয় ইলেকট্রনের সরবরাহ করে। ক্যাথোডে উৎপন্ন OH^{-} আসলে দ্রবণে উপস্থিত সোডিয়াম আয়ন (Na^{+}) মিলিত হয়ে দ্রবণে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড (NaOH)



চিত্র-৮.১৫: সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণের তড়িৎ বিশ্লেষণ

হিসেবে থাকে। তাহলে সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণকে বিদ্যুৎ-বিশ্লেষণ করলে ক্লোরিন ও হাইড্রোজেন গ্যাসের সাথে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড উপ-জাত যৌগ (bi-product) হিসেবে পাওয়া যায়।

৮.১৮ তড়িৎ বিশ্লেষণে উৎপাদিত পদার্থের বাণিজ্যিক ব্যবহার

তড়িৎ বিশ্লেষণের মাধ্যমে আকরিক থেকে বিভিন্ন ধাতু যেমন– সোডিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম, তামা, দস্তা, লোহা, সিসা প্রভৃতি নিষ্কাশন করা হয়। আধুনিক বিশ্বে এসব ধাতুর ব্যবহার অপরিসীম। লোহার বাণিজ্যিক ব্যবহার সর্বক্ষেত্রেই বিস্তৃত। দালান, ইমারত, রেলপথ, পাকা রাস্তা-ঘাট, সেতু, যানবাহন, বিমান, জাহাজ, যন্ত্রপাতি, কলকারখানা, আসবাবপত্র প্রভৃতি তৈরিতে লোহা ছাড়া বিবেচনা করা যায় কি? তাছাড়াও লোহার সংকর, ইস্পাত শক্ত ও মরিচারোধী ধাতব পদার্থ হিসেবে সমাদৃত। বাণিজ্যিকভাবে ইস্পাত লোহার পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। তামা দিয়ে তৈরি বৈদ্যুতিক তার বহুল ব্যবহৃত হয়। স্বল্প বিদ্যুৎরোধী হওয়ার কারণে তামার তার বাণিজ্যিকভাবে বেশি সমাদৃত। অ্যালুমিনিয়াম ধাতু ওজনে হালকা হওয়ায় বিমান তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। তাছাড়াও রান্না-বান্না করার জন্য ব্যবহৃত হাড়ি-পাতিল অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরি।

বাণিজ্যিকভাবে ইলেট্রোপ্লেটিং-এর মাধ্যমে লোহায় অন্য ধাতুর বিশেষ করে দস্তা ও ম্যাগনেসিয়াম-এর মরিচারোধক প্রলেপ দেওয়া হয়। এতে লোহার স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পায়। ইলেট্রোপ্লেটিং-এর সাহায্যে কোনো ধাতুর উপর অন্য ধাতুর প্রলেপ দিলে তা অত্যন্ত মসৃণ হয়। সহজলভ্য কোনো ধাতুর উপর মূল্যবান ধাতুর প্রলেপ দিয়ে বিভিন্ন ধরনের আর্কষণীয় অলংকার তৈরি করা হয়। যেমন– রূপার তৈরি অলংকারের উপর সোনার প্রলেপ দিয়ে অলংকারের উজ্জ্বল্য বৃদ্ধি করা হয়।

পানির তড়িৎ বিশ্লেষণের মাধ্যমে উৎপন্ন হাইড্রোজেন গ্যাস মূল্যবান ও পরিবেশবান্ধব জ্বালানি। হাইড্রোজেনকে পোড়ালে পরিবেশের জন্য প্রয়োজনীয় পানি ও তাপ উৎপন্ন হয়। হাইড্রোজেন গ্যাস বর্তমান সময়ের ফুয়েল সেলের সবচেয়ে ভালো জ্বালানি। সমুদ্রের পানির তড়িৎ বিশ্লেষণে উৎপন্ন ক্লোরিন গ্যাস বাণিজ্যিকভাবে জীবাণুনাশক হিসেবে ব্যবহার করা হয় এবং বিভিন্ন কারখানার কাঁচামাল হিসেবে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড ক্ষার প্রচুর ব্যবহার করা হয়।

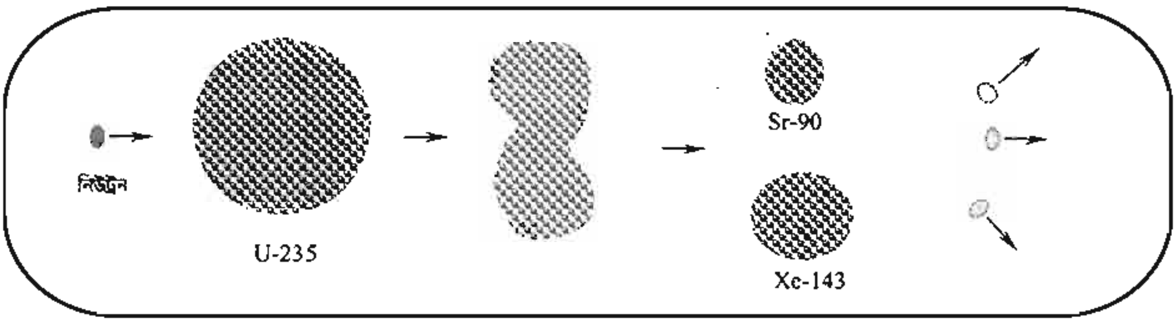
৮.১৯ নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া ও বিদ্যুৎ উৎপাদন

আমরা রাসায়নিক বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে দেখেছি যে, সর্ববহিঃস্থ শক্তিস্তরের ইলেকট্রন আদান-প্রদান বা ভাগাভাগির মাধ্যমে রাসায়নিক বন্ধন গঠিত হয়। নিউক্লিয়াসের কোনো পরিবর্তন হয় না, অর্থাৎ কোনো নতুন পরমাণুর গঠন হয় না, বরং পরমাণুগুলো সর্ববহিঃস্থ শক্তিস্তরের ইলেকট্রনের পরিবর্তনের মাধ্যমে সংযুক্ত হয়ে যৌগ গঠন করে। এক্ষেত্রে সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl) ও পানি (H_2O) যৌগ গঠনের কৌশল বিবেচনা কর। এখানে আমরা এক বিশেষ ধরনের বিক্রিয়া সম্পর্কে জানব যেখানে ইলেকট্রনের বিষয়টি সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, এখানে বিক্রিয়ার ফলে নতুন মৌলের সৃষ্টি হয়।

আমরা জানি, হাইড্রোজেন ব্যতীত, অন্য সব মৌলের নিউক্লিয়াস দু'ধরনের মৌলিক কণা দ্বারা গঠিত। কণাগুলো হলো– প্রোটন ও নিউট্রন। বড় মৌলসমূহ বিশেষ করে যাদের পারমাণবিক সংখ্যা 83-এর বেশি তাদের নিউক্লিয়াস স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভেঙে ছোট ছোট নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়। এভাবে বড় নিউক্লিয়াস ভেঙে ছোট নিউক্লিয়াস তৈরি হওয়ার সময় প্রচুর পরিমাণে শক্তি আলোকরশ্মি হিসেবে নির্গত হয়। বিষয়টিকে তেজস্ক্রিয়তা (radioactivity) বলে। যেমন– পোলোনিয়াম-210 (Po) স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভেঙে সিসা-206 (Pb) ও ইউরেনিয়াম-238 (U) ভেঙে থোরিয়াম-234 উৎপন্ন হয়। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আলফা কণা (দ্বি-ধনাত্মক হিলিয়াম-4) উৎপন্ন হয়। আবার ছোট ছোট

নিউক্লিয়াস একত্রে যুক্ত হয়ে বড় নিউক্লিয়াসও উৎপন্ন হতে পারে, যেমন উচ্চ তাপমাত্রায় (15 মিলিয়ন °C) দুটি হাইড্রোজেন পরমাণুর নিউক্লিয়াস যুক্ত হয়ে হিলিয়াম নিউক্লিয়াস তথা হিলিয়াম পরমাণু উৎপন্ন করে। সূর্যের মধ্যে এধরনের বিক্রিয়া ঘটে থাকে। তাহলে আমরা বুঝলাম যে, নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ায় বড় নিউক্লিয়াস ভেঙে ছোট ছোট নিউক্লিয়াস তৈরি হয়, যাকে নিউক্লিয়ার ফিসন (nuclear fission) বলা হয়। আবার ছোট ছোট নিউক্লিয়াস যুক্ত হয়ে বড় নিউক্লিয়াসও তৈরি হতে পারে। একে নিউক্লিয়ার ফিউসন (nuclear fusion) বিক্রিয়া বলে।

তেজস্ক্রিয়তা হলো নিউক্লিয়ার ফিসন বিক্রিয়া। কোনো মৌলের তেজস্ক্রিয়তার হার বহুগুণে বাড়ানো সম্ভব। যদি কোনো তেজস্ক্রিয় মৌলকে উচ্চশক্তিসম্পন্ন নিউট্রন দ্বারা আঘাত করা হয়, তাহলে তেজস্ক্রিয় মৌলের নিউক্লিয়াসটি ভেঙে সাথে সাথে অনেক নতুন নিউক্লিয়াস সৃষ্টি করে। যেমন– ইউরেনিয়াম–235 কে উচ্চশক্তিসম্পন্ন নিউট্রন দ্বারা আঘাত করলে ফিসন বিক্রিয়ার ফলে 30টি বিভিন্ন মৌলের সৃষ্টি হয়। এই বিক্রিয়ায় প্রথমে স্ট্রোনসিয়াম–90 (Sr-90) ও জেনন–143 (Xe-143) তৈরি হয় ও দুটি উচ্চশক্তিসম্পন্ন নিউট্রন নির্গত হয়। উৎপন্ন নিউট্রন দুটি নতুন করে ইউরেনিয়াম–235 পরমাণু বা স্ট্রোনসিয়াম–90 (Sr-90) ও জেনন–143 (Xe-143) আঘাত করে অনুরূপভাবে নতুন পরমাণু ও নিউট্রন তৈরি করে। তাহলে একটি নিউট্রন দ্বারা একটি বড় পরমাণুকে আঘাত করলে দুটি নতুন ছোট পরমাণু ও দুটি নিউট্রনের সৃষ্টি হয়। এভাবে শিকলের ন্যায় নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া চলতে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত বিক্রিয়ার মাধ্যমে ভেঙে ছোট পরমাণু হওয়ার মতো পরমাণু অবশিষ্ট থাকে। একে নিউক্লিয়ার শিকল বিক্রিয়া (chain reaction) বলে। এভাবে ফিসন বিক্রিয়ায় নতুন নিউক্লিয়াস সৃষ্টির সাথে প্রচুর পরিমাণ শক্তিও নির্গত হয়। আসলে ফিসন বিক্রিয়া হলো তাপউৎপাদী বিক্রিয়া। এক মোল ইউরেনিয়াম–235 নিউক্লিয়ার ফিসন বিক্রিয়ার মাধ্যমে 2.0×10^{13} জুল শক্তি উৎপন্ন করে।



চিত্র–৮.১৬: নিউকিয়ার ফিসন বিক্রিয়ায় U–235 নিউকিয়াস একটি শক্তিযুক্ত নিউট্রন গ্রহণ করে ভেঙে ছোট ছোট নিউকিয়াস তথা পরমাণুতে পরিণত হয়।

তাহলে বুঝা গেল যে, নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ার মাধ্যমে অল্প পরিমাণ রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারের করে প্রচুর শক্তি উৎপন্ন করা যায়। এসো এবার আমরা নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া ও রাসায়নিক বিক্রিয়ায় নির্গত শক্তির মধ্যে একটি তুলনাচিত্র তুলে ধরি। এক মোল মিথেন গ্যাস পোড়ালে 891000 জুল শক্তি পাওয়া যায়। তাহলে এক মোল ইউরেনিয়াম–235 নিউক্লিয়ার ফিসন বিক্রিয়ার মাধ্যমে যে শক্তি পাওয়া যায় তার সমপরিমাণ শক্তি পেতে $(2.0 \times 10^{13} \div 891000) = 2.2 \times 10^{7}$ মোল মিথেন গ্যাস পোড়াতে হবে।

কাজ: 2.2×10^{7} মোল মিথেন গ্যাসের আয়তন নির্ণয় কর। উক্ত পরিমাণ মিথেন পোড়ালে কী পরিমাণ কার্বন–ডাই–অক্সাইড উৎপন্ন হবে তা হিসাব কর।

তাছাড়াও নির্গত কার্বন–ডাই–অক্সাইড পরিবেশের জন্য যে মারাত্মক ক্ষতি করবে তাও অনুধাবন করা সম্ভব।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ পারমাণবিক চুল্লিতে (nuclear reactor) ফিশান বিক্রিয়ায় উদ্ভূত শক্তিকে ব্যবহার বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে। উত্তর আমেরিকা তাদের বিদ্যুতের মোট চাহিদার 20% বিদ্যুৎ পারমাণবিক চুল্লি থেকে উৎপন্ন করে থাকে। পারমাণবিক চুল্লিতে ফিশন বিক্রিয়ার ফলে উদ্ভূত তাপশক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়। বিদ্যুৎ উৎপন্ন করার জন্য বিভিন্ন ধরনের পারমাণবিক চুল্লি ব্যবহৃত হচ্ছে। তন্মধ্যে লাইট ওয়াটার চুল্লি, হেভি ওয়াটার চুল্লি ও ব্রিডার চুল্লি অন্যতম। পারমাণবিক চুল্লির সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন সাশ্রয়ী হলেও এর ঝুঁকি খুবই মারাত্মক। ফিশান বিক্রিয়ার উৎপন্ন কোনো কোনো উৎপাদ মারাত্মক তেজস্ক্রিয় পদার্থ, এরা বহুবছর পর্যন্ত তেজস্ক্রিয়তা ছড়াতে পারে যা পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। তাছাড়াও পারমাণবিক চুল্লিতে দুর্ঘটনা ঘটে প্রাণিকুলসহ পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। সাম্প্রতিককালে জাপানের ফুকুশিমা পারমাণবিক চুল্লির দুর্ঘটনা অন্যতম। সমুদ্রতলে ভূমিকম্পের ফলে সৃষ্ট সুনামিতে (বন্যায়) ফুকুশিমা পারমাণবিক চুল্লির মারাত্মক ক্ষতি হয় এবং চুল্লি থেকে নির্গত তেজস্ক্রিয়তা পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে।



চিত্র–৮.১৭: পারমাণবিক চুল্লির মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন। চুল্লিটি ফ্রান্সের লরেইনি (Lorraine, France) নামক জায়গায় স্থাপিত।

৮.২০ পদার্থ দ্রবীভূত করে ও রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তাপের পরিবর্তন পরীক্ষা (দলগত):

চল 3টি পলিথিনের ব্যাগে আনুমানিক 25 সি সি করে পানি লও এবং ব্যাগগুলিকে শনাক্তকরণ নম্বর 1, 2 ও 3 দাও। ব্যাগের মুখ আটকানোর জন্য সুতা আগে থেকেই কেটে নাও। এবার ব্যাগ–1 এ সামান্য চুন (ক্যালসিয়াম অক্সাইড) যুক্ত করে মুখটি সুতা দিয়ে বন্ধ কর। এবার ব্যাগের গায়ে হাত দিয়ে তাপমাত্রার পরিবর্তন লক্ষ কর। একইভাবে ব্যাগ–2 ও ব্যাগ–3 –এ যথাক্রমে সোডা (Na_2CO_3) ও খাবারের সোডা ($NaHCO_3$) যোগ কর। তারপর ব্যাগ 2টিতে লেবুর রস বা লঘু এসিডের দ্রবণ যোগ করে তাড়াতাড়ি ব্যাগের মুখ শক্ত করে আটকিয়ে দাও ও পরিবর্তন লক্ষ কর। এবং ছক–2 প্রত্যক্ষ ঘটনাবলি লিপিবদ্ধ কর।

ব্যাগ	সংযুক্ত দ্রব	লক্ষণীয় পরিবর্তন	সম্ভাব্য বিক্রিয়া	বিক্রিয়ার ধরন
1				
2				
3				

ছক–৮.২: তাপউৎপাদী ও তাপহারী বিক্রিয়ার পরীক্ষা

সতর্কতা ও পরামর্শ : (১) এসিড দ্রবণ ব্যবহার না করাই উত্তম, তবে লঘু দ্রবণ সাবধানতার সাথে ব্যবহার করা যেতে পারে, (২) মুখ বন্ধ করার পূর্বে যতদূর সম্ভব ব্যাগের মধ্যকার বাতাস বের করে দিতে হবে ও (৩) কোনো পরিবর্তন লক্ষণীয় না হলে পানির পরিমাণ কমিয়ে বেশি পরিমাণে দ্রব যুক্ত করতে হবে।

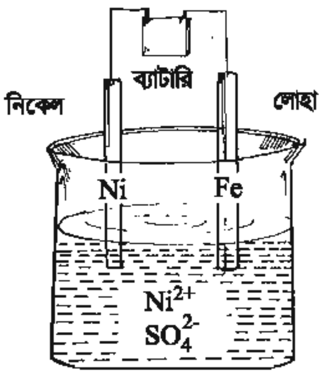
অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. বিদ্যুৎ পরিবহনের কৌশলের উপর ভিত্তি করে পরিবাহী কত প্রকার?

ক. এক খ. দুই

গ. তিন ঘ. চার



ইলেকট্রোপ্লেটিং –এর কৌশল

উপরের চিত্রের আলোকে ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

২. উদ্দীপকের প্রক্রিয়ায় উদ্দেশ্য কী? লোহার–

ক. পরিমাণ বৃদ্ধি করা খ. ক্ষয়রোধ করা

গ. দৃঢ়তা বৃদ্ধি করা ঘ. বিশুদ্ধ করা

৩. উপরের চিত্রে–

i. Ni ক্ষয়প্রাপ্ত হয়

ii. Fe অ্যানোড তড়িৎদ্বার হিসেবে কাজ করে

iii. ইলেকট্রনের আদান–প্রদান ঘটে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪. ড্রাইসেলে নিচের কোনটি জারক হিসেবে কাজ করে–

ক. Zn দণ্ড খ. MnO_2

গ. কার্বন দণ্ড ঘ. NH_4^+

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

১.

i. পেট্রোলিয়াম + $O_2 \longrightarrow CO_2 + H_2O$ + শক্তি

ii. $^{238}U + {}_0n^1 \longrightarrow {}_{56}Ba + {}_{36}Kr + 3{}_0n^1$ + শক্তি

iii. $Zn + CuCl_2 \longrightarrow ZnCl_2 + Cu$ + শক্তি

ক. ইলেকট্রোপ্লেটিং কী?

খ. তড়িৎ রাসায়নিক কোষে লবণসেতু কেন ব্যবহার করা হয়।

গ. উপরের কোন বিক্রিয়া থেকে প্রাপ্ত শক্তি গাড়ি চালানের কাজে ব্যবহার করা যায়? কারণসহ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতের জন্য উপরের বিক্রিয়াগুলোর উপযোগিতা বিশ্লেষণ কর।

২.



ক. ধাতব পরিবাহী কী?

খ. এসিডমিশ্রিত পানিকে তড়িৎ বিশ্লেষ্য পরিবাহী বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. উপরের কোষে সংঘটিত বিক্রিয়া লিখ।

ঘ. উদ্দীপকে সংঘটিত বিক্রিয়ায় তড়িৎপ্রবাহের প্রয়োজনীয়তার যৌক্তিক ব্যাখ্যা দাও।